সময়ের ভাবনা

ইতিহাস পরিষদ

সময়ের ভাবনা

ইতিহাস পরিষদ

www.pathagar.com

সময়ের ভাবনা

প্রকাশক
ইতিহাস পরিষদের পক্ষে
এফ. রহমান
ছোট বলি মেহের
সাভার, ঢাকা।

ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী- ২০১৫

মূল্য ঃ ১০০.০০ (একশত) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

সূচি

১। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিরোধী ষড়যন্ত্র এগিয়ে চলেছে ০৫-১২

২। বাংলাদেশে জাতীয় সংহতি ও সমঝোতার প্রশ্ন ১৩-২৬

৩। দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজত ২৭-৫২

৪। সরকারের পতন আতঙ্ক ও বেপরোয়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ৫৩-৫৯

৫। অথঃ ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগ সমাচার ৬০-৬৭

৬। দুঃশাসন সরকার পতন অনিবার্য করে তোলে ৬৮-৭৪

৭। ইল্লত যায় না ধুইলে স্বভাব যায় না মইলে ৭৫-৮২

৮। প্রশাসন ও অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ভারতীয় হস্তক্ষেপ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ৮৩-৯১

৯। নূহ (আ.) এর কিস্তি পরিষ্কার আওয়ামী লীগ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার ৯২-৯৯

১০। কাদ নাজালা ইয়াজুজু ওয়া মাজুজু ফি বাংলাদেশ ১০০-১০৬

১১। সরকারের অগ্রাধিকার পরিবর্তন ও প্রধানমন্ত্রীর দেশপ্রেম তত্ত্ব ১০৭-১১৬

১২। আওয়ামী লীগের জামায়াত বিদ্বেষ ঃ কিছু কারণ ও বিশ্লেষণ ১১৭-১২২

১৩। সন্ত্রাস জিহাদ এবং প্রপাগান্ডার লক্ষ্য-উপলক্ষ্য ১২৩-১৪২

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

অনেক ত্যাগ-কোরবানী ও সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। জুলুম, নির্যাতন, বন্দুক-কামানের গোলা যে জাতিকে থামাতে পারেনি, আদর্শচ্যুতির কারণে সে জাতি আজ হতাশায় নিমজ্জমান। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক সুবিধাবাদী তথাকথিত রাজনীতিবিদ ও লুটেরাদের কাছে দেশ এবং দেশের মানুষ আজ জিম্মি। দিন যত যাচ্ছে ততই আমরা আশাহত হচ্ছি। বিশ্বের মানচিত্রে আমরা মর্যাদাহীন হয়ে পড়ছি। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সুশীল সমাজের দায়িত্ব ছিল দেশের সকল ধর্ম, শ্রেণি-পেশার মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার আরেকটি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া। আর তা না করে আমরা দেখতে পাই স্বাধীনতার পরপর সংকট সমাধান না করে বরং একের পর এক তা বৃদ্ধিই করা হয়েছে। আদর্শ ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট ঐ চিহ্নিত মহলটি চার দশক পর নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে স্বাধীনতার পক্ষ সেজে তাদের বিরোধীদের স্বাধীনতার বিপক্ষ সাজিয়ে দেশে আরেকটি সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে জাতীয় ভিত্তি দুর্বল করে দেশকে বিদেশী শক্তির তাবেদার বানাতে চাচ্ছে। পৃথিবীর তাবত ইতিহাস পর্যালোচনায় কোথায়ও এমনটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আজকে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে দল-মত ভুলে সকল সচেতন দেশ-প্রেমিকদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রয়োজন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সকল ষড়যন্ত্রের মুলোৎপাটন করে দেশ গড়ার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ। আর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা পাওয়ার প্রত্যাশায় এদেশের খ্যাতিমান কয়েকজন কলামিষ্ট, সাংবাদিক ও লেখকদের সমকালীন কিছু লেখা নিয়ে "সময়ের ভাবনা" নামে আমাদের এ সংকলন। বর্তমান ক্রান্তিকালীন সময়ে যে সকল দেশ-প্রেমিক জনতা দেশ-মাতৃকার কল্যাণে এগিয়ে আসতে চায় এই সংকলনটি তাদের চেতনাকে শানিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাহলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে।

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সময়ের ভাবনা

বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ববিরোধী ষড়যন্ত্র এগিয়ে চলেছে!

– সিরাজুর রহমান**

একাত্তরের ২৫ মার্চের সে কাল রাত্রির পর আওয়ামী লীগ নেতাদের অসহায় অবস্থা কল্পনা করা মোটেই কঠিন নয়। প্রতিরোধ সংগ্রাম কিংবা হাতে অস্ত্র তুলে নিতে নয়, তাদের পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ শেখ মুজিবুর রহমান দিয়েছিলেন। সেদিন বিকেল ৪ টায় মুজিব তার একান্ত সচিব (যিনি নিজেকে বলতেন 'তল্পিবাহক') জমির উদ্দিনকে ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে পাঠান তার ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব সম্বন্ধে জুলফিকার আলী ভুট্টোর অভিমত জেনে আসতে। পরবর্তী বিবরণ জমির উদ্দিনের নিজের কথায় :

"তখন আমাকে মোস্তফা খার (ভুট্টোর প্রবক্তা) বললেন যে, ভুট্টো সাহেব এখন ঘুমাচ্ছেন, তুমি সন্ধ্যা ৮ টায় এসো। আমি যখন ৮টার সময় গেলাম, উনি আমাকে সুইমিং পুলের দিকে নিয়ে যান। নিয়ে গিয়ে বলেন, 'চিড়িয়া তো ভেগে গিয়েছে'। চিড়িয়া বলতে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বুঝিয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। এসে মুজিব ভাইকে বললাম, মুজিব ভাই, প্রেসিডেন্ট তো চলে গেছেন। তিনি কথাটা হাঁ-করে শুনলেন। আর কিছু বললেন না আমাকে। আমাকে আবার বললেন, তুমি আবার যাও,

---

** জনাব সিরাজুর রহমান *একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং কলামিষ্ট। তিনি ১৯৩৪ সালে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি ১৯৬০ সালে বিবিসি বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালে বাংলা বিভাগের উপ-প্রধান থাকা অবস্থায় বিবিসি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। জনাব রহমান বিবিসি বাংলা বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি লন্ডনে বসবাস করছেন।*

www.pathagar.com

ভুট্টো কী বলে শুনে আসো। আমি আবার গেলাম। তখন প্রায় ১০টা বাজে। মোস্তফা খার বললেন N তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান না, ভুট্টো সাহেব দেখা করতে চান না। আবার আসলাম, খুব ভারাক্রান্ত মনে শেখ মুজিবের বাড়িতে ঢুকলাম। তখন প্রায় সাড়ে ১০টা বাজে। আমি দেখলাম, (ব্যারিস্টার) আমির-উল ইসলাম সাহেব বেরিয়ে যাচ্ছেন। আর ছিলেন আমাদের পুলিশের আইজি জনাব মহিউদ্দিন সাহেব। তিনি আমাকে দেখে বেরিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, মুজিব ভাই একটা সোফার ওপর শুয়ে আছেন। আমার মনে হলো যে, তার প্রায় পাঁচ পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছে, সকালে আমি যখন দেখি তখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ে। পাইপটা হাতে ছিল তার। আমি বললাম, ভুট্টো সাহেব তো দেখা করলেন না। উনি বললেন, জানিরে, ওরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। এরপর আমি খুব নিকটে গিয়ে তার সোফার কাছে বসলাম N কার্পেটের ওপরে। তার গায়ে হাত দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আমি তাজউদ্দীনদেরকে বলেছি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার জন্য; কিন্তু আমি কী করি বল। যদি আমি ধরা না দিই ওরা তো পাগলা কুত্তার মতন আমার সব ওয়ার্কারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে"।

আওয়ামী লীগ নেতারা 'আন্ডারগ্রাউন্ড' নয়, 'ওভারগ্রাউন্ডে' সদলবলে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত চলে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ সঙ্গীসাথী নিয়েছিলেন দু-একজন, কেউ কেউ বলতে গেলে এক বস্ত্রে। ভিন্ন দেশে থাকার আশ্রয়, অন্নবস্ত্রের সংস্থান ইত্যাদি কেমন দুরূহ, কাউকে বলে দিতে হবে না। তাদের কপাল ভালো ছিল। ভারত সরকার দু'বাহু বাড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। দয়া-দাক্ষিণ্যের কারণে নয়, বৈষয়িক স্বার্থে। এর কিছু ঐতিহাসিক কারণ ছিল। ২৪ বছর আগে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে হিন্দুস্তান (ভারত) ও পাকিস্তান হয়েছে N হিন্দু অধ্যুষিত রাজনৈতিক সংস্থা কংগ্রেসের ঘোরতর বিরোধিতা সত্ত্বেও। কাশ্মীর, জুনাগড়, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের এখানে-সেখানে বিতর্কিত ও অবাস্তব সীমান্ত নিয়ে দুই রাষ্ট্রের জন্মের সময় থেকে অনেক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয়রা গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছিল যে, বিভক্ত ও দুর্বল রাষ্ট্র পাকিস্তান বেশি দিন টিকতে পারবে না, অন্তত তারা টিকতে দেবে না;

কিন্তু বিশ্ব পরিস্থিতির বাস্তবতাকে তারা বিবেচনায় নেয়নি। কমিউনিস্ট সোভিয়েত সাম্রাজ্য আর মার্কিন নেতৃত্বে ধনতান্ত্রিক পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে বিরোধ বিশাল একখানি কালো মেঘের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর

www.pathagar.com

আকাশকে ঘনঘটাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নতুন স্বাধীন ভারত সোভিয়েতের পক্ষ নেয়ায় ধনতান্ত্রিক জোটের উদ্বেগ আরো বেড়ে যায়। সোভিয়েতকে ঘিরে সমরবলয় সৃষ্টির (এবং ভারতের সমরশক্তির পাল্টা হিসেবে) উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত সমরজোট সেন্ট্রাল ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সেন্টো) এবং সাউথইস্ট এশিয়ান ট্রিটি অর্গানাইজেশনে (সিটো) পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বলতে গেলে, অঢেল সমরাস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে প্রথম শ্রেণির সমরশক্তিতে পরিণত করা হয়। তার মোকাবিলায় ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয় হু হু করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ দিকে, কাশ্মীর নিয়ে ১৯৪৮ এবং ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ পরাজিত করতে পারেনি, তার বিজয় চূড়ান্ত হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিম, দু'টি ফ্রন্টে সার্বক্ষণিক সমর প্রস্তুতি বজায় রাখার জন্য ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা ব্যয় ভারতের জন্য দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের রণকৌশলীরা এর একমাত্র সমাধান দেখতে পান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে।

দৈব আশীর্বাদ

পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের জন্য যেন এক প্রকার দৈব আশীর্বাদ হয়েই এসেছিল। '৭১ সালে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের আতিথেয়তার জন্য ভারত কোনো ব্যয়েই কুণ্ঠিত হয়নি। স্বাধীনতার পরে কলকাতায় গিয়ে শুনেছি, আওয়ামী লীগ নেতাদের কারো কারো বিনোদনের ব্যয়ও বহন করেছে ভারত সরকার; কিন্তু ভারতের বেনিয়া বুদ্ধি তখনো সক্রিয় ছিল। আওয়ামী লীগ নেতাদের আশ্রয়, আপ্যায়ন-বিনোদন দানের বিনিময়ে তারা ভবিষ্যতের জন্য যথাসম্ভব সব স্বার্থ আদায় করে নিতে চেয়েছিল। হয়তো দিল্লির লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে না দিয়ে প্রথমে সিকিমের মতো ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা। তার কাঠামো হিসেবেই ভারতাশ্রয়ী অসহায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে সাত দফা গোপন ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়।

সে চুক্তির মূল কথা ছিল, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষা পরিচালিত হবে দিল্লি থেকে। সাউথ ব্লক (পররাষ্ট্র মন্ত্রক) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করবে, আর ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের বহির্দেশীয় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেবে। চুক্তিতে বলা হয় যে, বাংলাদেশের

www.pathagar.com

নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না। সে জন্যই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনীর অপসারণ দিল্লির কাম্য ছিল না। চুক্তিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআরকে (যারা একাত্তরে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথমেই অস্ত্র ধারণ করেছিল) ভেঙে দেয়া হবে এবং তার স্থলে ভারতের সীমান্তরক্ষী বিএসএফ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে একটি সীমান্ত রক্ষীবাহিনী গঠন করা হবে।

পাকিস্তান থেকে লন্ডন হয়ে দেশে ফেরার পথে দিল্লিতে স্বল্পকালীন যাত্রা বিরতিকালেই শেখ মুজিবুর রহমানকে সাত দফা চুক্তিটির কথা জানানো হয়েছিল; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার পরেই মুজিব স্থির করেছিলেন যে, সাত দফা চুক্তিটির কিছুতেই তিনি গ্রহণ করবেন না। ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য তিনি পীড়াপীড়ি শুরু করেন। এমনকি ৭২-এর মার্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং ঢাকা সফর করেও মুজিবকে মত পরিবর্তনে রাজি করাতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্ব সমাজ বাংলাদেশকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের জনপ্রিয়তাও তখন তুঙ্গে। সে পরিস্থিতিতে তার সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাওয়া ভারত বিজ্ঞজনোচিত মনে করেনি।

ওরা মুজিব হত্যার সুযোগ নিতে চেয়েছিল সেই হিসেবে '৭৫-এর ১৫ আগস্টের ঘটনাবলীতে সাউথ ব্লকের খুব বেশি অসন্তুষ্টির কারণ ঘটেনি। কিন্তু বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তারা যখন খোন্দকার মোশতাককে রাষ্ট্রপতির আসনে বসায়, তখন দিল্লি প্রমাদ গুনেছিল। তারা অবশ্যই জানতেন যে, মোশতাক কিছুতেই সাত দফা চুক্তি ফিরিয়ে আনতে রাজি হবেন না। তাজউদ্দীন আহমদ যখন সে চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হন, খোন্দকার মোশতাক তখন নির্বাচিত সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। চুক্তির বিরুদ্ধে তার দৃঢ় অবস্থান ভারত সরকারের বিরক্তি এবং তাজউদ্দীনের বিব্রত হওয়ার কারণ ঘটিয়েছিল। ভারতপন্থী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফের সামরিক অভ্যুত্থান এসব কারণেই ঘটেছিল বলে অনেকে তখন মনে করতেন। লেঃ জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রবল জাতীয়তাবাদী অবস্থানের পরিচয় পেতেও ভারতের বিলম্ব হয়নি। সে কারণেই জিয়া প্রশাসনের সাথে ভারত সরকার সহযোগিতা সামান্যই করেছে। এমনকি রাষ্ট্রপতি জিয়ার উদ্যোগে গঠিত সার্ক সংস্থার বিকাশেও ভারত তেমন উৎসাহ দেখায়নি।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা গভীর শোকের সময় ভারতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। দিল্লির প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা খুবই স্বাভাবিক। দিল্লিতে তাদের তত্ত্বাবধান করেছিল তাদের বিশেষ সংস্থা। দিল্লির সমাজজীবনের সাথে তাদের মেলামেশার সুযোগ ইন্দিরা গান্ধীর সরকার রাখেনি। অর্থাৎ বাংলাদেশের সে সময়ে ইতিহাস তারা জেনেছিলেন অন্যের বয়ান অনুযায়ী। আরো অনেক পরে, ২০০৬-২০০৯ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর নিয়ামক ছিল ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। একটি পত্রিকা গোষ্ঠী এবং সেনাপ্রধান মইন উ আহমেদ তাদের সহযোগিতা দিয়েছেন। আর শেখ হাসিনা তো নিজেই বলেছেন, বর্ণচোরা ওই সামরিক সরকার ছিল তারই 'আন্দোলনের ফসল'। তা ছাড়া কারোই এখন অজানা নেই যে, আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতাসীন হয়েছিল এই যোগসাজশেরই ফলে।

তার গদি লাভের দু'মাসের মধ্যেই বিডিআরের বিদ্রোহ ঘটে এবং যেন অকস্মাৎ একাত্তর সালের সাত দফা চুক্তিটির '৭১-এর একাংশ বাস্তবায়ন হয়ে যায়। শেখ হাসিনা অতি সম্প্রতি সে বিদ্রোহের জন্য বিএনপির ও ২০ দলের নেতা খালেদা জিয়াকে দোষী বলে ঘোষণা করেছেন। বাস্তবে দেশে এবং বিদেশে তার এ দাবি কেউ বিশ্বাস করার কথা নয়। খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা আওয়ামী লীগকে বিদ্বেষপ্রবণ করেছে। দলটি নিজের কৃত অপকর্মগুলোর দায় খালেদা জিয়ার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তি পেতে চায়।

সন্দেহের আঙুল উল্টো দিকে

অনেক কারণে সন্দেহের আঙুল বরং উল্টো দিকেই নির্দেশিত হয়। প্রথমত, আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা (প্রধানত তাপস, আজম আর নানক) বিদ্রোহের কয়েক দিন আগে থেকে মুঠোফোনে বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ করছিলেন বলে তখনো খবর রটেছিল। দ্বিতীয়ত, প্রথম দফা খুনের পর বিদ্রোহীরা গণবভনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দীর্ঘ আলোচনা করছিল এবং তারপর প্রধানমন্ত্রী তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেন। তৃতীয়ত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এবং আরো দু-তিনজন মন্ত্রী এরপর পৃথক পৃথকভাবে পিলখানায় যান এবং সেদিন সন্ধ্যায় নতুন করে হত্যাযজ্ঞ

www.pathagar.com

শুরু হয়ে যায়। চতুর্থত, সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন থেকে মেজর জেনারেল পর্যন্ত ৫৭ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পিলখানায় সমূহ বিপদের মধ্যে ছিলেন। তাদের উদ্ধারের জন্যও সেনাবাহিনীকে পিলখানায় যেতে দেয়া হয়নি। স্বয়ং সরকার প্রধান মাঝপথে তাদের থামিয়ে দিলেন কেন? তা না হলে সে অফিসারদের অনেকেই হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতে পারতেন। একখানি রহস্যঘেরা বাসভর্তি মাথায় রুমাল বাঁধা কিছু রহস্যজনক ব্যক্তির হঠাৎ আবির্ভাব এবং হত্যাকাণ্ডগুলোর পর হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া নিয়ে বহু জল্পনা হয়েছে। বিডিআরের শত শত সদস্যের শাস্তি হয়েছে, বন্দী অবস্থায় অনেকে মারা গেছে।

একটা তদন্তও হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত বহুল প্রচারিত অভিযোগগুলোর কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। অন্য দিকে বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের সাথে সম্পৃক্ত বিডিআর বাহিনীটি ভেঙে দেয়া হয়েছে (একাত্তরের সাত দফা চুক্তি যে শর্ত ছিল) এবং একই ধারায় বিজিবি বাহিনী গঠন করা হয়েছে। ৫৭ জন উচ্চপদস্থ অফিসারের হত্যাযজ্ঞের বিরাট ক্ষতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কোনো দিন পূরণ করতে পারবে কিনা একমাত্র ভবিষ্যতই বলতে পারবে। এনএসআই নামের গোয়েন্দা বাহিনীতে বহু ছাত্রলীগ সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে পত্রিকাতে খবর উঠেছে।

বিজিবি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজ আহমেদ গত সপ্তাহে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ বিজিবি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবে। আরো উল্লেখ্য, মাত্র কয়েক দিন আগে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, বিএসএফ কয়েকজন বিজিবি সদস্যকে তাদের কার্যক্রম দেখাতে কাশ্মীর সীমান্তে নিয়ে গিয়েছিল। আলোচ্য দুটো খবর থেকে অনেকের মনেই এমন সন্দেহ হতে পারে যে, ভারত প্রকৃতই ১৯৭১ সালের সাত দফা চুক্তি (শেখ হাসিনার পিতা যে চুক্তি অগ্রাহ্য করেছিলেন) বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠেছে।

বিএসএফ কী শেখাবে বিজিবিকে

শিক্ষক, এমনকি গৃহশিক্ষক নিয়োগের বেলাতেও প্রার্থীর যোগ্যতা ও চরিত্র বিবেচনা করা হচ্ছে নিয়ম। তাই এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে, বিএসএফের

www.pathagar.com

কাছ থেকে বিজিবি কী শিক্ষা নেবে? বিএসএফের অতীত ইতিহাসও অবশ্যই বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ সংস্থাটি কখনো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। ভারতীয়রা পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে ঢুকে গরু-ছাগল ধরে আর ফসল কেটে নিয়ে গেছে, বাংলাদেশীদের জমি দখলও করে নিয়েছে বহুবার। এবং প্রায় সময়ই এসব অপকর্ম করেছে বিএসএফের সংরক্ষণে থেকে। বিএসএফ সদস্যরা অনেকবার বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কুড়িগ্রাম একটি ঘটনায় তাদের একটি দল বাংলাদেশের কয়েক মাইল অভ্যন্তরে ঢুকে বিডিআরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে কয়েকজন মারা যায়।

বিগত ছয় বছরে সীমান্তে বিএসএফের ঔদ্ধত্য বিশ্বসংবাদ সৃষ্টি করেছে। প্রায় প্রতিদিনই সীমান্তে বাংলাদেশীদের গুলী করে হতাহত করা হয়েছে। ফেলানীর নাম তাদের প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে লেখা হয়ে থাকবে। বাংলাদেশ এবং ভারত সরকারের মন্ত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, 'সীমান্তে মারণাস্ত্র ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ হবে', বাংলাদেশীদের আর হত্যা করা হবে না। সাড়ে পাঁচ বছর পর মনে হয় বন্দুকের ব্যবহার যেন কমেছে। গুলীর পরিবর্তে পিটিয়ে মারা হচ্ছে বাংলাদেশীদের। ভাবছি, যে লোকটা মারা গেল, রাইফেলের গুলীর পরিবর্তে লাঠিপেটা খাওয়ায় তার মৃত্যু যন্ত্রণায় কোনো ইতর-বিশেষ হলো কিনা।

যত দূর জেনেছি, যেসব ছিঁচকে চোরাচালানি ভারত থেকে সামান্য কিছু জিনিস এনে বাংলাদেশে বিক্রি করে, ঘুষের অঙ্ক নিয়ে বিরোধের কারণেই বিএসএফের জওয়ানরা এই দরিদ্র হতভাগ্য মানুষগুলোকে অবলীলায় খুন করছে। অন্য দিকে দেখুন, বাংলাদেশের ইলিশ শত শত টনে সীমান্তে পেরিয়ে যাচ্ছে। ইলিশের দেশের মানুষের জন্যে মৎস্যরানি ইলিশ এখন অতীতের স্মৃতি মাত্র। সে জন্য কি কোনো চোরাচালানি গুলি কিংবা লাঠিপেটা খাচ্ছে? মারা যাচ্ছে কোনো ইলিশ চোরাচালানি? বিএসএফের কাছ থেকে কি এটাই শিখতে হবে যে, বিএসএফ যেমন বিনাবাধায় বাংলাদেশী ইলিশ ভারতে চলে যেতে দিচ্ছে, তেমনি ভারতীয় ফেনসিডিলও যেন বিনাবাধায় বাংলাদেশে আসতে দেয়া হয়?

www.pathagar.com

মাদকের কারখানা কেন আমাদের সীমান্তে?

আরেকটা খবর যেন চিনাবাদামের খোসার মতো অবহেলায় ফেলে দেয়া হয়েছে আলোচ্য সংবাদ সম্মেলনে। বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর ফেনসিডিল তৈরির কারখানাগুলো ভারত বন্ধ করবে না। অজুহাত হিসেবে বলা হয়েছে, ফেনসিডিল নাকি ভারতে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ওষুধের প্রয়োজন যদি বিশাল ভারতের হয়, তাহলে কারখানাগুলো কেন বাংলাদেশের সীমান্তের লাগোয়া নির্মাণ হয়েছে এবং হচ্ছে? কারখানাগুলো কেন ভারতের অন্যত্র নির্মাণ হচ্ছে না, যেমন করে বিয়ার, হুইস্কি ইত্যাদি সুরাজাতীয় পানীয়ের কারখানা ছড়িয়ে আছে ভারতের সর্বত্র?

কিছু দিন আগে বাংলাদেশের এক শিল্পপতি ব্যবসায় উপলক্ষে ইউরোপ আর যুক্তরাজ্যে এসেছিলেন এবং আমার সাথে দেখা করে যান। তিনি বলছিলেন, উত্তর বাংলাদেশসহ যেসব সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএনপির প্রভাব বেশি, ফেনসিডিলের চালান সেখানেই আসছে। এই আশায় যে, বিষাক্ত মাদক সেবন করে বিএনপি কর্মীরা প্রথমে কিছু চেঁচামেচি ও মাতলামি করে ধীরে ধীরে তারা সব কর্মোন্মাদনা হারিয়ে ফেলবে। অন্য দিকে ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডারদের জন্য আসে সস্তা ভারতীয় হুইস্কি। সে হুইস্কি পান করে তারা রাতে ফুর্তি করে, আর দিনের বেলায় লুঙ্গি ও টুপি পরে অনেকে নাকি 'মসজিদের চাঁদা' তুলতে যায়।

বাংলাদেশকে সিকিমে পরিণত করার সব পথ সুগম করে দেয়া হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারিতে দিল্লিতে গিয়ে কতকগুলো গোপন চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নদী ও বন্দরগুলো বিনামাশুলে ব্যবহারের অধিকার ভারতকে দিয়ে আসা হয়েছে। তখন থেকেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ বেড়েছে। সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারে গত বছর দিল্লি যেমন অশোভনভাবে হস্তক্ষেপ করেছে, আধুনিককালে তার নজির সত্যিই বিরল। ৫ জানুয়ারির তামাশার নির্বাচনের পরে অবৈধ সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য ভারতীয় কূটনীতিকরা বিশ্বব্যাপী দাপাদাপি করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের পররাষ্ট্রনীতিও সাউথ ব্লক থেকে পরিচালনা করতে চায় নয়াদিল্লি।

- (লন্ডন, ০২.০৯.১৪), দৈনিক নয়া দিগন্ত ঃ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪

www.pathagar.com

বাংলাদেশে জাতীয় সংহতি ও সমঝোতার প্রশ্ন

– আবুল আসাদ**

স্বাধীনতা-উত্তরকালে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এক পর্যায়ে জাতীয় সংহতি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার শক্তিশালী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা উপলক্ষে 'বাঙালীরা ক্ষমা করতে জানে' কথা দিয়েই তার এই উদ্যোগের যাত্রা শুরু।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী যে সামাজিক সম্পর্ক, সমন্বয় ও বাস্তবতার চাওয়াকে সম্মান করে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা উত্তর সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন এবং সামাজিক ও বাস্তব কারণে দালাল আইন অকার্যকর হয়ে পড়েছিল, সে বিষয়টিও নতুন করে সামনে আসা উচিত দৈনিক ইত্তেফাকের একটা মন্তব্য প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'কাদের বিচারের কথা কারা বলছে।' কিছু লোকের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি উঠার প্রেক্ষিতে এ সংক্রান্ত একটি আলোচনার উক্ত শিরোনাম দেয়া হয়েছে। ইত্তেফাকের আলোচনায় স্বাধীনতা যুদ্ধের ৪২ বছর পর যুদ্ধাপরাধী খোঁজা ও তাদের বিচার দাবির অন্তঃসারশূন্যতার বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার ৪২ বছর পর যারা একটা অন্তঃসারশূন্য দাবি তুলে পানি ঘোলা করেছে, ওরা কেউ অপরিচিত নয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে এদের দেখা গেছে। দেখা গেছে এদের স্বাধীনতা উত্তর সরকারের সাথে সাপে নেউলের মত জঙ্গরত

** **জনাব আবুল আসাদ** *একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিষ্ট এবং জনপ্রিয় লেখক। তিনি ১৯৪২ সালে রাজশাহী জেলার বাঘমারা উপজেলার এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী ইউনির্ভাসিটি থেকে ইকোনোমিকসে মাস্টার্স করেন। কলেজ জীবন থেকেই তার সাংবাদিকতা শুরু। লেখক, সংবাদদাতা হিসেবে তিনি পয়গাম, দৈনিক পাকিস্তান, আজাদ, সাপ্তাহিক জাহানে নও, প্রভৃতি পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। দৈনিক সংগ্রামের মাধ্যমেই সহকারী সম্পাদক হিসাবে তার সার্বক্ষণিক সাংবাদিকতা জীবনের শুরু। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার লেখনির মধ্যে রয়েছে "কাল পচিশের আগে ও পরে", "একশ বছরের রাজনীতি", "আমরা সেই সে জাতি" ইত্যাদি। এছাড়া তার লিখা "সাইমুম সিরিজ" পাঠক সমাজে অতি সমাদৃত।*

www.pathagar.com

অবস্থায়। এরাই আজ স্বাধীনতার ৪২ বছর পর যুদ্ধাপরাধ আর যুদ্ধাপরাধী তালাশ করেন। এটা তাদের নিছক একটা অজুহাত। এই অজুহাত তোলার লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার সবচেয়ে শক্তিশালী রক্ষাকবচ 'ইসলাম' এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শক্তি 'ইসলাম পন্থী'দের দুর্বল করা। এটা ভারত চায় তাদের দীর্ঘকালের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে। এদেরই বশংবদ একটি মহল স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশ গড়ার আন্দোলন বাদ দিয়ে বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির আন্দোলন শুরু করেন। দেশকে বাকশালের খপ্পরে ঠেলে দেবার নিমিত্ত তারাই। অন্তত স্বাধীনতা উত্তর সরকারের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এই কথাই বলেছিলেন সেদিন জাতীয় সংসদে। তিনি দেশের নৈরাজ্যকর অবস্থার জন্যে বিরোধীদলগুলো বিশেষ করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং গোপন বিপ্লবী দলগুলো এবং তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে দোষারোপ করেছিলেন। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে চারজন সংসদ সদস্যসহ তা দলের হাজারও কর্মীর মৃত্যুর জন্যে সংগঠিত রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে দোষারোপ করেছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, বিরোধী কিছু উপদল গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে সে অস্ত্র দিয়ে লুট ও হত্যার মাধ্যমে তার সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিল। এই কতকটা এই ধরনেরই একটা কথা বলেছিলেন পিটার কাস্টারস তার জবানবন্দীতে। তার জবানবন্দীর এক জায়গায় আছে, '১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মমতাজ উদ্দিন খান ঢাকা আসিলে তাহাকে সঙ্গে নিয়া ড. আখলাকুর রহমান সাহেবের বাসায় যাই। ইহার ২/৩ দিন পর মমতাজ উদ্দিন আমাকে নিয়া সিরাজুল আলম খানের বাসায় যান। সিরাজুল আলম খান মত প্রকাশ করেন যে, কৃষকদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি করতে হইবে এবং লাইনে কাজ করিলে তাহার দল জাসদ পার্টি সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে।'

দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা উত্তরকালে একশ্রেণীর বামরা তদানীন্তন সরকারের উৎখাত এবং সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টির কাজে লিপ্ত ছিলেন, যুদ্ধাপরাধের তদন্ত ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে তাদের কোন সহযোগিতা সাহায্য ছিল না। আসলে সরকার কর্তৃক চিহ্নিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার তারা চায়নি। কারণ ভারত চায়নি যে, পাকিস্তানী সৈন্যের ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার হোক। এর পিছনে রহস্য ছিল, সিমলা চুক্তি (২ জুলাই ১৯৭২) এবং দিল্লী এগ্রিমেন্ট (২৮ আগস্ট ১৯৭৩)

www.pathagar.com

অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার মধ্যে বাংলাদেশে ধৃত পরে ভারতে আশ্রয়ে যাওয়া পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীরাও শামিল ছিল। এর বড় প্রমাণ হলো, দিল্লী এগ্রিমেন্ট ধারা-৩ এর ৩ ও ৫ উপধারায় যেখানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে আটকে পড়া মানুষ বিনিময়ের কথা আছে। সেখানে যুদ্ধবন্দীর উল্লেখ নেই। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের উল্লেখ আছে ধারা-৩ এর উপধারা ১ এবং ২-এ, কিন্তু এর বিনিময়ে বাংলাদেশের ভূমিকার কোন উল্লেখ নেই। অন্যদিকে উপধারা ৬-এ ভারত-প্রতিশ্রুত পাকিস্তানী বন্দী বিনিময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচার না করার বাংলাদেশের সম্মতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ সম্মতি বাংলাদেশ কখন দিল সে কথার কোন উল্লেখ নেই।

উল্লেখ্য, দিল্লী এগ্রিমেন্টটি সিমলা চুক্তির মতই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এর পরিষ্কার অর্থ হলো, বাংলাদেশের মতামতের তোয়াক্কা না করেই ভারত পাকিস্তানের সাথে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের চুক্তি করেছিল। যুদ্ধাপরাধীদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে এইভাবে ভারতের ইচ্ছাটি প্রধান হিসাবে কাজ করেছে। সেই সময়ের জাসদরা ভারতের এই ইচ্ছা অনুসারেই তখন এ ব্যাপারে টু শব্দটি করেননি কিংবা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি। ইনু সাহেব শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী। সেই জাসদের অনেকেই এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিতে পাগল হয়ে উঠেছেন কেন? কারণ সেই একই। যে ভারতের ইচ্ছার কারণে সেদিন বামরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাননি, আজ সেই ভারতের ইচ্ছা পূরণের জন্যেই তারা বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধ বিচারের জন্যে রাতের ঘুম হারাম করেছেন। উদ্দেশ্য দেশের দেশপ্রেমিক শক্তিকে বিতর্কিত করা এবং দেশের সামাজিক, সুস্থিরতাকে নষ্ট করে দেশকে আরও সংকটের মুখে ঠেলে দেয়া, যাতে বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্র প্রমাণিত করা সহজ হয়।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বামরা যেমন বিদেশী মিশন বাস্তবায়নে ব্যস্ত ছিলেন, আজও তেমনি বিদেশী মিশন নিয়েই তারা সামনে এগুতে চাচ্ছেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের কি হলো? তারা কেন স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধান এবং তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

পদদলিত করে শাহরিয়ার-ইনুদের পিছনে চলেছেন? তারা ভুলে গেলেন স্বাধীনতা-উত্তর শেখ মুজিব সরকারের কলাবরেটরদের (চারটি বড় অপরাধ ছাড়া) ক্ষমা ঘোষণার যৌক্তিকতার কথা এবং চিহ্নিত চারটি বড় অপরাধের দীর্ঘ দু'বছর কোন মামলা দায়ের না হওয়ার বাস্তবতার বিষয়?

কারও ভুলে যাওয়াতে কিন্তু ইতিহাস পাল্টায় না। শেখ মুজিব সরকার ভারতীয় চাপে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীসহ ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবার পর স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় কলাবরেটরদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেন। স্বাধীনতা-উত্তর শেখ মুজিবের সরকার কিন্তু হঠাৎ করেই কলাবরেটরদের ক্ষমা ঘোষণা করেননি। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও যুদ্ধাপরাধী পাকিস্তানী সৈন্যদেরই যখন অবস্থার কারণে বা অবস্থার প্রয়োজনে নিঃশর্তে ছেড়ে দিতে হলো, তখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেশের যারা পাকিস্তানী সৈন্যের সহায়তা করেছেন বা তাদের সহযোগী হয়েছেন, তাদের শাস্তি দেয়ার যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি বলেই বাংলাদেশের তদানীন্তন সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কলাবরেটরদের সাধারণ ক্ষমা করেন। ঘটনা কিন্তু এটা নয়। কলাবরেটরদের ক্ষমা ঘোষণা এ ধরনের কোন চিন্তা থেকে হয়নি। সাধারণ দাবি ও সাধারণ জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতেই এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হয়। ১৯৭২ সালের মার্চ থেকেই আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজলের মত দেশের শীর্ষ বুদ্ধিজীবীসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তরফ থেকে কলাবরেটরদের ছেড়ে দেবার আবেদন ও দাবি উত্থিত হতে থাকে। এককালীন আওয়ামী লীগ নেতা এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী একজন সর্বজনমান্য নেতা জনাব আতাউর রহমান খান এই সময় এক বিবৃতিতে বলেন, "জাতি পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধান না করে সরকার সারা দেশে দালাল ও কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত আছেন। মনে হচ্ছে, এটাই যেন সরকারের সব চাইতে প্রধান কর্তব্য। যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হননি, তাদের উপর গুরুতর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোন উপকার হবে না। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের আগে যারা বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের অনেকে সরকারের উচ্চপদে আসীন হয়েছেন, অথচ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যারা পাক বাহিনীকে সমর্থন দান করতে

www.pathagar.com

বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে কিংবা শরণার্থী হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। এই আইন জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং এই আইনের মাধ্যমে বিচার একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার ও সকল বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ করছি।"

এই ধরনের বিভিন্ন বিবৃতি ও দাবির প্রেক্ষিতে এবং দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর শেখ মুজিবের সরকার সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে নিম্নোক্ত 'প্রেস নোট' প্রচার করেন:

"সরকার ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশে (১৯৭২) সালের রাষ্ট্রপতির ৮নং আদেশ মোতাবেক অপরাধের দায়ে দণ্ডিত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নটি পুনরায় বিবেচনার পর ঘোষণা করিতেছেন:

১. এই আদেশের ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) উক্ত আদেশ মোতাবেক যে কোন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড ১৮৮৮ সালের ফৌজদারীর দণ্ডবিধির ৪০১ ধারা মোতাবেক মওকুফ করা হইল এবং উক্ত আদেশ ব্যতীত অপর কোন আইন বলে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের সহিত জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতারী পরওয়ানা না থাকিলে সেইসব ব্যক্তিকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে। (খ) উক্ত আদেশ বলে যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে সে সব প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং এই আদেশ ব্যতীত অপর কোন আইনে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধের হুলিয়া না থাকিলে তাদেরকে সরকারি হেফাজত হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। (গ) এই আদেশ বলে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধের দায়ে যে সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে অথবা তদন্ত চলিতেছে সেই সব মামলা ও তদন্ত কার্য বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সব গ্রেফতারী পরওয়ানা অথবা আদালতের হাজির হওয়ার নির্দেশ এবং এই আদেশ বলে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ থাকিলে ইহা বাতিল বলিয়া

www.pathagar.com

গণ্য হইবে এবং অপর কোন আইনে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য না হইলে তাহাদেরকে সরকারি হেফাজত হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে; তবে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে দণ্ডিত হইয়া থাকিলে অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা থাকিলে তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালতে হাজির হইয়া ক্ষমা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকিবে।

২. এই আদেশ বলে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা (হত্যা), ৩০৪ ধারা (হত্যার চেষ্টা কিন্তু হত্যার শামিল নয়), ৩৬৭ ধারা (ধর্ষণ), ৪৩৫ ধারা (অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন), ৪৩৬ ধারা (ঘরবাড়ি ধ্বংসের অভিপ্রায়ে অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন) এবং ৪৩৮ ধারা (জাহাজে অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন) মোতাবেক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ১ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ক্ষমা প্রদর্শন প্রযোজ্য হইবে না।

মুজিব সরকারের এই ক্ষমা ঘোষণা সর্বমহল থেকে অভিনন্দিত হয়। মুজিব সরকারের প্রবল বিরোধী এবং বাম আন্দোলনের গুরু বলে পরিচিতি, ভাসানী ন্যাপের সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তার এবং দলের সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক এক বিবৃতিতে বলেন, 'ন্যাপ বহু আগে থেকেই নিরপরাধ ব্যক্তিদের মুক্তি দাবি করে আসছে।' বিবৃতিতে বাংলাদেশ দালাল আইন সংক্রান্ত আইনের ৮নং ও ৫০ নং ধারা বাতিল করার দাবি জানান। তিনি ১৫ ডিসেম্বর আরেক বিবৃতিতে বলেন, 'ক্ষমা চাই, সমানাধিকার চাই। রাষ্ট্রপতি আদেশের ৫০ ও ৮ ধারা বাতিল চাই।' বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান তার বিবৃতিতে বলেন, 'আরো আগেই দেশের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। এর ফলে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেবেন।' দেশের প্রবীণ রাজনীতিক ও চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকারকে অভিনন্দিত করে বলেন, 'জনগণের ভাগ্যকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্যে সরকার সঠিক পন্থাই বেছে নিয়েছেন। গণতন্ত্রের এ উদ্যম বজায় থাকলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে।' সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা এবং স্বনামধন্য কলামিস্ট ও লেখক আবুল

www.pathagar.com

মনসুর আহমদ (স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের পিতা) বলেন, 'আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় সরকার যখন একবার অনুকম্পার দরজা খুলিয়াছেন, ষোল হাজারের মতো বন্দীকে মাফ করিয়া দিয়েছেন, তখন বাকী সবার ক্ষেত্রেও তেমনি উদারতা প্রদর্শন করুন। অন্যথায় দুই বছর পরে আজ যেমন চারশ লোককে প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হলো, বার বছর পর (৩৭ হাজার দালালদের বিচারে ১২ বছর লাগবে) মানে গ্রেফতারের সময় হতে ১৪ বছর পর আরো অনেক লোককে তেমনি মুক্তি দিতে হইতে পারে।' (ইত্তেফাক, ২ নভেম্বর, ১৯৭৩)। তদানীন্তন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ শেখ মুজিব সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করে বিবৃতি দেয়।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মত ১৯৭৬ সালে কলাবরেটর আইনের বাতিলও ছিল অবস্থার একটা স্বাভাবিক পরিণতি। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছিল ১ লাখ লোককে এবং ৩৭৪৭১ জন দালালকে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের বিচারের জন্য ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এই ৭৩টি ট্রাইব্যুনালে ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলার বিচার কাজ সম্পন্ন হয়। এদের মধ্যে দণ্ডিত হয় মাত্র ৭৫২ জন, তাও প্রায় সব ক্ষেত্রেই ছোটখাটো অপরাধের জন্য। অবশিষ্ট ২০৬ জন খালাস পেয়ে যান। এই পটভূমিতে ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়। সাধারণ ক্ষমার অধীনে ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর ছাড়া পেয়ে যায় ৩০ হাজার বন্দী। কিন্তু হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগ এই চার অপরাধের বিচার, গ্রেফতার ও শাস্তি বিধানের আইনী বিধান বহাল রাখা হয়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারে ১৯৭৬ সালের দালাল আইন বাতিল হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ দুই বছর এক মাস সময়ে উক্ত চার অপরাধের অভিযোগে একটিও মামলা দায়ের হয়নি। এই অবস্থার পটভূমিতেই ১৯৭৬ সালের জানুয়ারিতে দালাল আইন বাতিল হয়ে যায়।

এখানে একটা বড় প্রশ্ন হলো ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর হতে ১৯৭৬ সালে জানুয়ারি পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে কোন মামলা দায়ের হলো না কেন? এর একটি জবাব হলো ঐ চারটি অপরাধের ক্ষেত্রে দায়েরযোগ্য কারও কোন অভিযোগ ছিল না। এই জবাবটি বাস্তব নয়। কারণ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও সংঘাতে দায়েরযোগ্য ঐ ধরনের কোন অপরাধ ছিল না তা হতে পারে না। অন্য আরেকটি জবাব এই হতে পারে যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিও ছিল, অপরাধও ছিল

www.pathagar.com

কিন্তু সংশ্লিষ্ট সংক্ষুব্ধরা অভিযোগ বা মামলা দায়েরে আগ্রহী হয়নি। এটাই বাস্তবতা বলে ধরে নেয়া যায়। কেন আগ্রহী হয়নি? কেন সংক্ষুব্ধ মানুষ অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য মামলা দায়েরে এগিয়ে যায়নি? খুব বড় একটা প্রশ্ন এটা; এক কথায় এর কোন জবাব মিলবে না। এই প্রশ্নের জবাব প্রকৃতপক্ষে সন্ধান করতে হবে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো এবং বাংলাদেশের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সমন্বয় চিন্তার মধ্যে। এই ক্ষেত্রে এই সময়ের সুন্দর একটা সমাজ বিশ্লেষণ দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক ড. তারেক মুহাম্মদ তওফীকুর রহমান তার "বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলেম সমাজ : ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)" শীর্ষ গ্রন্থে। মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পর অবস্থার উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়ে আসার সাথে সাথে দালাল আইনে ধৃত এবং বিচারের সম্মুখীন ব্যক্তিদের বিচার সংক্রান্ত বিষয়টি সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার সৃষ্টি করে চলছিল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে–এই সামাজিক চিত্রটি এক কথায় সামনে আনার পর তিনি লিখেছেন :

"আপাত: পরস্পর বিছিন্ন ও শত্রুতার নেপথ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ হলো 'কমপ্যাক্ট সোসাইটি।' আবহমান কাল থেকে শাশ্বত গ্রাম্য সালিশ বিচার ব্যবস্থার প্রচলনে গ্রামীণ সমাজে যে ভারসাম্য বর্তমান ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তা নতুন আঙ্গিকে ও নেতৃত্বে স্থিতিশীল হয়ে আসতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের উত্তেজনা কেটে যেতে থাকে এবং মুক্তিযোদ্ধাগণও সমাজের দৃঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে থাকেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তীতে উত্তেজনা প্রশমনে রক্তের বন্ধন, আত্মীয় সূত্রতা এবং সমাজগোষ্ঠীর বন্ধনে অপরাধকারী দালালদের আশ্রয় দেবার ব্যাপক প্রবণতা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। 'ক্ষমাই মহত্তের লক্ষণ' এই মহানুভবতার চিরন্তনী আবহে লালিত বাংলার মানস গঠন শাস্তি বিধানের পরিবর্তে সামাজিক সালিশ ও সমঝোতার পথেই অগ্রসর হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় একই পরিবারের পিতা শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছে, অপরদিকে পুত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। পিতা ও পুত্রের এই বিপরীত অবস্থান দীর্ঘদিন আক্রোশ মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি।

মুক্তিযোদ্ধা পুত্র দালাল পিতাকে বাঁচানোর জন্য তদ্বির শুরু করতে কণ্ঠিত হয়নি। অনেক দালাল এমনও ছিল যে, তারা গোপনে মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয়

www.pathagar.com

দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে এবং প্রয়োজনমত নিরাপত্তা দিয়েছে। দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত ঐ ব্যক্তিটি পরবর্তীকালে ঐসব মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং আশ্রয় পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থায় বা ভিন্নভাবে যাই হোক না কেন, মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রায় দুই হাতে ধৃত ও অভিযুক্ত দালালদের ছেড়ে দেবার সুপারিশ করতে থাকে। যা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দফতরকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে তোলে। গ্রাম্য সালিশ, দেনদরবার, তদ্বির হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যকার কারণে পরবর্তীকালে কিছু ব্যতিক্রম বাদীপক্ষগণ মামলা চালাতে উদ্যোগ গ্রহণ হতে পিছিয়ে আসে, এমনকি মামলার ন্যূনতম সাক্ষ্য জোগাড় করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।"

এটাই ঘটনা। সামাজিক রাজনৈতিকসহ নানা ধরনের সম্পর্ক ও আত্মীয়তার বাঁধন স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর পক্ষ-বিপক্ষকে সমন্বয় ও সমঝোতার দিকে নিয়ে যায়। সৈয়দ আবুল মকসুদ 'প্রথম আলোতে তার 'সহজিয়া কড়চায়' এই কথাই লিখেছেন এইভাবে, "কোন যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দালালদের বিচার না হওয়ার মূল কারণ, অনেক মন্ত্রী, সংসদ নেতা ও বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানীদের সহযোগী ছিল। তাদের বাঁচাতে গিয়ে সকলকেই বাঁচিয়ে দেয়া হয়। (প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর, ২০০৭)। শুধু বাঁচিয়ে দেয়া নয়, দীর্ঘ দুই বছর এক মাস সময় পর্যন্ত দালাল আইন বহাল তবিয়তে থাকলেও খুন, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ এই চার অপরাধের অভিযোগে মামলা দায়ের না হবার এটাও একটা কারণ। আরেকটা কারণ হলো মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান ছিল কিংবা পাকিস্তান বাহিনীর সহায়ক হিসেবে রাজাকার-এর মত যে সব বাহিনী কাজ করেছে, যুদ্ধাপরাধী বা অপরাধী শুধুমাত্র তাদের মধ্যেই ছিল না অন্যান্য দল ও গ্রুপের মধ্যেও যুদ্ধাপরাধী বা অপরাধী ছিল। এ বিষয়ে সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন : "এখনকার পত্রিকা পড়লে মনে হয় শুধু মুসলিম লীগ, জামায়াত বা নেজামে ইসলামীর লোকেরাই পাকিস্তানীদের দালাল ছিল। বস্তুত সবশ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যেই পাকিস্তানীদের সহযোগী ছিল। আব্দুল হক তার কম্যুনিস্ট পার্টির নামের সাথে বাংলাদেশ হবার পরও 'পূর্ব পাকিস্তান' রেখে দেন। অত্যন্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ পাকিস্তানীদের সহযোগিতা করছেন। (প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর, ২০০৭)। এমনকি মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন গ্রুপের পরস্পরের মধ্যেও যুদ্ধাপরাধ বা

www.pathagar.com

অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন বিবরণীতে এক দৃষ্টান্ত আছে। সম্প্রতি এটিএন-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী এক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধী বলতে আমরা জানি একটা ইসলামী দলকে বোঝানো হয়েছে যারা ডানপন্থী। আমি বলবো যুদ্ধাপরাধীতো সরকারী কর্মচারিও ছিল। আমি আপনাকে প্রমাণ দিতে পারি। কারণ আমি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। একজন বাঙালী ক্যাপ্টেন মারা যায় সরাইলে। মুক্তিযোদ্ধারা তাকে হত্যা করে। কিন্তু ঐ ক্যাপ্টেনকে পরে শহীদ উল্লেখ করা হয়। সুতরাং যখন যুদ্ধাপরাধী বলবেন তখন সবাইকে বলতে হবে।'

সবাইকে যুদ্ধাপরাধী বলতে হচ্ছে বলেই স্বাধীনতা উত্তরকালে অবশেষে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরে এগিয়ে যায়নি কেউ। দু'বছর সময়কালে দালাল আইনে মামলা দায়ের না হবার এটাও একটা বড় কারণ। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতাসহ উপরোক্ত সব কারণ সম্মিলিতভাবে ১৯৭৬ সালে দালাল আইন বাতিল করার পটভূমি রচনা করে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে বিষয়টা এইভাবে প্রতিভাত হবার সময়ের দাবি পূরণের অংশ হিসেবেই তিনি দালাল আইন বাতিল করেন। আওয়ামী লীগসহ যারা এ জন্য জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করেন, তারা নিছকই রাজনীতি করেন, বাংলাদেশের সমাজ ও জনগণের কথা, এমনটি তাদের মন কি বলে সেটাও বিবেচনা করেন না।

আসলে এক শ্রেণীর সুবিধাবাদীরা, বামরা এবং আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দল বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধাচারণের তাদের যে রাজনীতি, সে রাজনীতির খোরাক হিসাবেই ব্যবহার করা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধের বিচার ও স্বাধীনতা বিরোধী শ্লোগানকে। তারা প্রতিবেশী দেশের ইচ্ছা ও দলীয় রাজনৈতিক প্রয়োজনেই জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলামী দলগুলোর কথা ইসলামের উৎখাত চায়। তারা যে প্রকৃত অর্থেই ইসলামের উৎখাত চায় তার নগ্ন প্রকাশ ঘটে শাহরিয়ার কবিরের একটা উক্তির মধ্য দিয়ে। সম্প্রতি ইটিভির একটি অনুষ্ঠানে সংবিধানের মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের বিতাড়ন ঘটিয়ে 'আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসকে সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণের বিরোধিতা করতে গিয়ে

www.pathagar.com

তিনি বলেন : "সংবিধানের মূলনীতি পরিবর্তন করা হলে বাংলাদেশে রাষ্ট্র তার নৈতিকতা হারিয়ে ফেলবে। এই রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন নেই। এটাই যদি এই রাষ্ট্র হবে কেন আমরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করলাম? কেন আমরা পাকিস্তান ভাঙলাম? আমরা যদি ঐ হুকুমত কায়েম করতে চাই পাকিস্তানই আমাদের জন্য ভালো ছিল, বড় দেশ ছিল। আমরা একটা সেক্যুলার দেশ চেয়েছিলাম বলে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি।" শাহরিয়ার কবীরের ইসলামবিরোধী এই রূপ শাহবাগী নাস্তিক ব্লগারদের একজন গুরু হিসেবে আজ আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে।

উপরের উক্তিতে শাহরিয়ার প্রকৃতপক্ষে যা বলেছেন তাহলো : বাংলাদেশে ইসলাম থাকলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রই তার দরকার নেই। এখানে বলে রাখা ভালো, সেক্যুলারিজম প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে, শাহ-রিয়ার কবিরের এই কথা সর্বৈব মিথ্যা। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌম অধিকার কায়েমের জন্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের এটাই সারকথা এবং মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছে এ লক্ষ্যেই। শতকরা ৯০ জন মুসলিমের দেশ বাংলাদেশে ইসলাম থাকবে, এটা শুধু নীতিগত নয়, গণতন্ত্রের কথাও। তবে শাহরিয়ার কবিররা ইসলাম চাইবে না এটাই স্বাভাবিক। কারণ তাদের বামপন্থা ও তাদের পরভোজী রাজনীতির এটাই চরিত্র। এই চরিত্র দ্বারা তাড়িত হয়েই তারা জামায়াতে ইসলামীকে উৎখাত প্রচেষ্টায় একটা অজুহাত হিসেবে জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত যুদ্ধাপরাধ ও স্বাধীনতা বিরোধিতার শ্লোগান তুলছে।

শাহরিয়ার কবির তার এই শ্লোগান তুলতে পারেন। কারণ তারা স্বাধীনতা-উত্তর জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের আমলেও বিদেশী স্বার্থের শিখণ্ডিপনার পরিচয় তারা দিয়েছেন। তখন বিদেশী ষড়যন্ত্রে যেমন তারা স্বাধীনতা- উত্তর সরকারকে উৎখাত করে বিজাতীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠায় রত ছিল, আজও তেমনি তারা বিদেশী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ ইসলামের উৎখাত করে দেশকে বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের কি হলো? তারা তাদের নেতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি এবং স্বাধীনতার উত্তর সরকারের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি কি ভুলে গেলেন, না

www.pathagar.com

পরিত্যাগ করলেন? শেখ মুজিবুর রহমান তদন্তের মাধ্যমে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করে তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে যুদ্ধাপরাধ চ্যাপ্টার ক্লোজ করেছেন এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে নিছক 'কেয়ারটেকার' হওয়াকে শাস্তিযোগ্য করার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত শেখ মুজিবুর রহমানের এসব সিদ্ধান্তকে আওয়ামী লীগ কি আজ অন্যায়, অবাঞ্ছিত বলে মনে করছে? কিন্তু আওয়ামী লীগ তো এই কথা বলছে না। এটা যদি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার তাদের রাজনীতি হয়, তাহলে তাদের জানা দরকার জনগণের ইচ্ছার প্রতিধ্বনি করে স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবই এই রাজনীতিকে অচল করে দিয়ে গেছেন। জনগণও এই সাথে একে সমাধিস্থ করেছে। এই কারণেই দালাল খান-এ সবুর তিন আসন থেকে নির্বাচিত হন, শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, বিচারপতি নূরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের মনোনীত এমপি প্রার্থী হতে পেরেছিলেন, মাওলানা নূরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার বেয়াই হয়েছেন। হাজার বলেও যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধী বলে জামায়াতে ইসলামীকে খাটো করা যাবে না। স্বাধীনতা উত্তরকালে তদন্ত করে তৈরি যুদ্ধাপরাধীদের তালিকায় জামায়াতে ইসলামীর কারও নাম ছিল না এবং দালাল আইনে যে ৭৫২ জনের শাস্তি কনফার্ম করা হয়েছিল, তাদের মধ্যেও ছিল না জামায়াতে ইসলামীর কোন লোক। এখন যে জামায়াত নেতাদের বিচার চলছে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। এ অভিযোগগুলো এ সময়েই ইনভেনশন।

বিভেদের এই হিংসাত্মক অভিযান শুধু স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের নীতি ও ইচ্ছার ব্যতিক্রম নয়, পৃথিবীর চলমান সংস্কৃতিরও ভায়োলেশন। আন্তঃজাতি যেমন, তেমনি দেশ জাতির অভ্যন্তরেও সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। তেমনি আবার খুব স্বাভাবিক হলো তাদের সমঝোতা প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয়ের ঘটনা। আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শক্তি, সমৃদ্ধি ও সংহতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ঘটেছিল ইতিহাসের ভয়াবহতম রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধটা ছিল দেশের উত্তরাঞ্চলের বা ইউনিয়ন সরকারের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের। যুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চল সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, দক্ষিণের আত্মসমর্পণের আগে থেকেই দুই অংশের মধ্যে সমঝোতা ও সমন্বয়ের কাজ শুরু হয়। যুদ্ধে

www.pathagar.com

বিজয়ী উত্তরাঞ্চল বা ঐক্যবাদী ইউনিয়ন সরকার বিদ্রোহী ও বিপর্যস্ত দক্ষিণের প্রতি উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে। দক্ষিণকে বলা হয়, তাদের অবশিষ্ট সৈন্য ও অস্ত্রধারীরা তাদের স্ব-স্ব বাড়িতে ফিরে যাবে এবং আর অস্ত্রধারণ করবে না। প্রতিশোধমূলক কিছুই ঘটবে না। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ঘোষণা করেন।"

অর্থাৎ "বিদ্রোহী বাহিনীর পরাজিত লোকেরা নিরস্ত্র হয়ে তাদের বাড়িতে যাক। অস্ত্রসমর্পণ ও বাড়িতে যাওয়ার পর আর বিদ্রোহ করবে না। তাদের অফিসার এবং সব লোকদের যেতে দাও। আমি চাই আনুগত্য, রক্তপাত নয়। আমি চাই একজনও শাস্তি না পাক। সবার সাথেই উদার আচরণ করা হোক।"

স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান কিছুটা দেরিতে হলেও আব্রাহাম লিংকনের এই ভূমিকাই পালন করেছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চিহ্নিত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ক্ষমা করতে ও পাকিস্তান ফেরত পাঠাতে বাধ্য হবার পর তিনি হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের সাথে সরাসরি জড়িতরা ছাড়া দালাল আইনের অধীন সকল অভিযুক্তের জন্যে ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন।

যদিও স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষমা ঘোষণা জর্জ আব্রাহাম লিংকনের ঘোষণার মত সার্বিক ছিল না, তবু এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা তার দেশপ্রেম ও জাতিপ্রেমের অনন্য প্রকাশ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিহিংসার বদল জাতীয় সংহতি, জাতি গঠন ও দেশের সমৃদ্ধি। কিন্তু আজ ৪২ বছর পর জাতির স্থপতির দল আওয়ামী লীগ তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে তার সমাপ্তি ঘটানো যুদ্ধাপরাধ ইস্যুকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং একে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার লক্ষ্যে ব্যবহার করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা ঘটেনি। ঘটেনি ভিয়েতনামেও। বাংলাদেশে কেন ঘটলো? আমাত মতে এর জবাব হলো : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ভিয়েতনামে আওয়ামী লীগের মত দল নেই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের পাশে ভারতের মত কোন দেশ নেই। নেই বলেই তাদের রক্ষা এবং আমরা বিপদগ্রস্ত। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ইচ্ছা এবং ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্যে মিলন ঘটার ফলেই

www.pathagar.com

বাংলাদেশের এই বিপদ ঘটেছে। ভারতের বড় ভাইগিরির পথে এদেশের দেশপ্রেমিক ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে শুরু থেকেই শত্রু ভেবে আসছে ভারত। চাচ্ছে তারা এই শক্তির বিলুপ্তি। ১৯৯৬-২০০১ সালের পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল, কিন্তু তখনও আওয়ামী লীগ বুঝে ওঠে সারেনি যে তার প্রধান প্রতিপক্ষ বিএনপিকে হারানোর ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় বাধা কোনটি। তাই এ সময় আওয়ামী লীগের প্রয়োজন ও ভারতের লক্ষ্য এক সাথে মিলতে পারেনি। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নিশ্চিত হয়, সেই বড় বাধাটা জামায়াতে ইসলামী। এরপরই এই শক্তিকে ঘায়েল করার জন্যে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে নানা দায় চাপানোর চেষ্টা শুরু হলো এবং ২০০৮ সালের পর এই চেষ্টা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হলো। আওয়ামী লীগের প্রয়োজন ও ভারতের প্রয়োজন এখানে এসে এক সাথে মিশে গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট এর টেলিফোন ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে এ বিষয়টা পরিষ্কার হয়। ঐ ট্রান্সক্রিপ্টে আছে ভারতের অ্যাকটিভ সাপোর্ট ও কোঅপারেশনেই বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু হয়।

এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধি, সংহতি, সমঝোতা ও সমন্বয় চাবিকাঠির সবটা যেন আমাদের হাতে নেই। এটা আমাদের হাতে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সিদ্ধান্ত।

- দৈনিক সংগ্রাম, ঈদুল ফিতর সংখ্যা ২০১৩

www.pathagar.com

দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার হেফাজত

- ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন**

ভূমিকা

দেশপ্রেশ এবং আত্মমর্যাদাবোধ স্বাধীন সার্বভৌম যে কোনও দেশের জন্য একটি সম্পদ। দেশের সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, সরকারি কর্মকতা-কর্মচারী এবং রাষ্ট্রনায়কদের দেশপ্রেম দেশের অস্তিত্ব, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। এদরে যে কোন একটি শ্রেণীর দেশপ্রেম ঘাটতি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। এ প্রেক্ষিতে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে দেশপ্রেমকে সর্বত্র সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়, দেশপ্রেমিকরা শ্রদ্ধার পাত্র হন এবং যাদের দেশপ্রেম নেই তাদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরা সর্বকালে, সর্বযুগে নিন্দার পাত্র। আত্মমর্যাদাবোধ দেশপ্রেমিকদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এই দুই এর সমন্বয় মানুষকে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখায় এবং আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে উজ্জীবিত করে। দেশপ্রেম ছাড়া মুসলিম মিল্লাতের কল্পনা করা যায় না। একটি আরবী প্রবচনে বলা হয়েছে 'হব্বুল ওয়াতন মিনাল ঈমান' অর্থাৎ দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ। বিগত শতাব্দীসমূহে

** **ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন** *একজন সিনিয়র সাংবাদিক, কলামিষ্ট এবং সাবেক সরকারী কর্মকর্তা। তিনি ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধানুক্রমে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে এমকম ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি যুক্তরাজ্যের ইষ্ট এংলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নত অর্থনীতিতে এমএস, লাববুরো কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমবায় ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানব সম্পদ ও উন্নয়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় উচ্চতর ডিপ্লোমা অর্জন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ পাবলিকেশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, থট্‌স্ অন ইকনোমিকস্ এর সম্পাদক ও দৈনিক সংগ্রামের সহকারী সম্পাদক হিসাবে কর্মরত আছেন।*

www.pathagar.com

এই উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের প্রতিকূল শক্তির মোকাবিলায় দেশপ্রেম ও ঈমানী দায়িত্ব পালনের বহু অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং এখনো স্থাপন করে চলেছে। তাদের সাফল্য গাঁথার বহু চিত্র ইতিহাস গ্রন্থ ও সাহিত্যের পাতায় ছড়িয়ে আছে এবং যুগে যুগে নতুন প্রজন্মকে উজ্জীবিত করছে। ভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতিতেও দেশ প্রেমের অনুরূপ নজির পাওয়া যায়।

রামায়ণের একটি আখ্যানকে কেন্দ্র করে কবি মধুসূদন দত্ত প্রণীত রূপকাশ্রয়ী কাহিনী মেঘনাদবদ কাব্যেও এর নজির রয়েছে। এই কাব্যে কুসুমদাম সজ্জিত দীপাবলী তেজে/উজ্জলিত নাট্যশালা সম আছিল এ মোর সুন্দরী পুরী- অর্থাৎ রাবনের সোনার লংকা বহিরাগত শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে লণ্ডভণ্ড ও ধ্বংস-প্রাপ্ত হতে দেখি, কিন্তু রাবন এর প্রতিকার করতে পারছেন না। তার দেশপ্রেম শৌর্যবীর্য কোনও কাজে আসছে না। এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য অস্ত্রবল, সৈন্যবল ও অর্থবলের তার কোনও কমতি ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও লংকায় 'একে একে শুকাইছে ফুল, নিভিছে দেউটি'। শত্রুর আক্রমণ আর তারই পিতৃব্য ঘরের শত্রু বিভীষণ রাবনের কপালে কলংক তিলক পরিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায়ও রাবন ভাঙ্গছে কিন্তু মচকাচ্ছে না। তারস্বরে সে জানিয়ে দিচ্ছে যে, পরবশ্যতা সে কিছুতেই মানবে না। দেশপ্রেম তার এতই শানিত এবং উচ্চকিত, আত্ম-মর্যাদাবোধ তার এতই প্রবল যে, কোন ভাবেই সে তা বিসর্জন দেবে না, ব্যক্তি স্বার্থে তো নয়ই। এখানে আত্ম-মর্যাদাবোধ ও দেশপ্রেমকে এই কাহিনীর মর্মবাণী হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ থেকে প্রায় ৪৩ বছর আগে, ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এর আগে ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে আমরা বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে প্রথম বারের মতো পাকিস্তানের অংশ হিসেবে স্বাধীনতা অর্জন করি এবং ২৪ বছর পর্যন্ত পাকিস্তানী হিসেবে আমাদের পরিচয় ছিল। কিন্তু যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের পূর্ব পুরুষরা রক্ত দিয়ে পাকিস্তান অর্জন করেছিলেন তা অর্জিত না হওয়ায় এবং শাসক শ্রেণীর অবিমৃশ্যকারিতায় ঐ দেশটি টেকেনি। তার ধ্বংস্তূপের উপর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার গত ৪৩ বছরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়ে এখনো প্রশ্ন উঠছে এবং পাশাপাশি এ দেশের নাগরিকদের দেশপ্রেম নিয়েও বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে এবং এ প্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে স্বাধীনতার হেফাজতের পন্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

www.pathagar.com

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে দেশপ্রেমের সংজ্ঞা, অর্থ, তাৎপর্য, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ, দেশপ্রেম উজ্জীবনে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা, দেশপ্রেমের অপব্যবহার, বিভিন্ন দেশে দেশপ্রেমের মাত্রা, ইসলামের দৃষ্টিতে দেশপ্রেমের মাপকাঠি, বাংলাদেশে দেশপ্রেমের অবস্থা এবং স্বাধীনতা সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দেশপ্রেমের সংজ্ঞা, অর্থ, তাৎপর্য, গুরুত্ব ও প্রকারভেদ

দেশপ্রেমের ইংরেজী প্রতিশব্দ Patriotism. গ্রীক Patria শব্দ থেকে Patriotism শব্দের উৎপত্তি। Patria অর্থ হচ্ছে The land of one's fathers, কোনও ব্যক্তির পিতৃপুরুষদের জন্মভূমি। Patriotism বা দেশপ্রেমের বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে। Weebies এর সংজ্ঞা অনুযায়ী দেশপ্রেম হচ্ছে, Love for or devotion to one's country. আবার Mike Wasdin নামক প্রখ্যাত রাজনীতি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে Patriotism বা দেশপ্রেম হচ্ছে "a feeling of love and devotion for one's own homeland". এখানে হোমল্যান্ড বলতে পিতৃভূমিকে বুঝানো হয়েছে। দেশপ্রেমের প্রজ্ঞা নিয়ে খুব কম লোকই প্রশ্ন তোলেন। এটা থাকা উচিত কিনা, থাকলে এর ধরন প্রকৃতি কি হওয়া উচিত এ ধরনের প্রশ্ন সচরাচর দেখা যায় না।

বর্তমান দুনিয়ায় রাষ্ট্র হচ্ছে দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড় সংগঠক। রাজনীতিবিদরা দেশাত্মবোধক বক্তৃতা বিবৃতি দিতে পছন্দ করেন, দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য সাধারণ নাগরিকদের পরামর্শ দেন এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক হিসেবে উপস্থাপন করেন। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যসমূহ সরকারি আমলাদের পরিচালনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় তোতা পাখির ন্যায় দেশপ্রেমের বুলি আওড়ায়, সরকারের বা সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের দেশপ্রেমকে মানুষের দরজা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ দেশপ্রেমের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন; শাসক দলের প্রচারধর্মী বক্তৃতা বিবৃতি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ডকুমেন্টারী, গান বাজনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিদেশী কালচার ও কুরুচিপূর্ণ নাটক সিনেমার প্রচার আদৌ দেশপ্রেম অথবা তাদের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল কিনা সে সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন।

www.pathagar.com

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাষ্ট্র ও সরকারের কাছে অবাঞ্ছিত বলে বিবেচিত কোন কোন বিষয়ে মতামত রাখার ব্যাপারে বাক ও লেখনীর স্বাধীনতাকে সীমিত বা খর্ব করার বাহানা হিসেবে দেশপ্রেমকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে সরকারি নীতি পলিসির সমালোচনা বা বিরোধিতাকে দেশপ্রেমের পরিপন্থী বা বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হয়। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটেই সম্ভবত স্যামুয়েল জনসন বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "Patriotism is the last refuge of a scoundrel" অর্থাৎ দেশপ্রেম হচ্ছে পাজি বদমাশদের সর্বশেষ আশ্রয়। তার এই উক্তির মমার্থ তাৎপর্যপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে দেশের প্রতি ভালবাসা বা আসক্তি থাকার প্রয়োজন আছে কিনা। কেউ কেউ মনে করেন যে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনও ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বা ইচ্ছা অনিচ্ছা কাজ করে না। কোনও দেশ বা এলাকায় জন্ম গ্রহণের বিষয়টি নিতান্তই আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপার। ব্যক্তির নিজের প্রতি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসা থাকার যৌক্তিকতা বোধগম্য। কিন্তু দেশের প্রতি অনুরূপ নিষ্ঠা ও ভালবাসা ব্যক্তিস্বার্থের কতটুকু অনুকূল তা খুঁজে দেখা প্রয়োজন। সমতল ভূমি ও পাহাড়িয়া অঞ্চল কিংবা উপকূলের বাসিন্দা ও সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারীদের দেশপ্রেমের মিটার এক রকম নয়। দেশপ্রেমে ঝুঁকি আছে। এই ঝুঁকি এবং স্বার্থের মিল না ঘটলে দেশপ্রেম ফলপ্রসূ হয় না। আবার জাতীয় পর্যায়ে স্বার্থের বিভিন্নতা এত বেশি যে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য ব্যক্তির স্বার্থের অনুকূল প্রমাণিত হয় না। কেননা এ ক্ষেত্রে তাকে নিজের স্বার্থের চিন্তা না করে এমন নীতি ও পলিসির প্রতি সায় দিতে হয় যা তার পছন্দ নয়। উইবিজ এর ভাষায়, "Patriotism is just a cover for collective thinking. It promotes the idea that the nation is responsible for any good that happens to the individual and the individual owes his life to the nation. Patriotism tries to assign any benefit that an individual receives not to the individuals' acts of people, but because of the collective good of the nation. Patriotism demands that the individual subjugates his desires to the collective interest of the nations, even to sacrificing himself,

www.pathagar.com

family and friends. Patriotism advocates group responsibility over individual responsibility."

কেউ কেউ মনে করেন যে দেশকে ভালবাসার যৌক্তিক কারণ থাকুক বা না থাকুক, দেশপ্রেম অধিকাংশ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রবৃত্তি বা দেশের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা তারা কিভাবে প্রকাশ করেন। দেশপ্রেম প্রকাশের বাহন কি এবং কিভাবে দেশ প্রেমিকরা প্রমাণ করেন যে অন্যদের তুলনায় তারা উত্তম এবং ভিন্ন দেশের নাগরিকদের চেয়ে তারা বেশি অধিকার ভোগ করেন। এই বিষয়টি নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে তেমনি দেশের মানুষ এবং বিদেশীদেরই বা তারা কোণ দৃষ্টিতে দেখেন তাও গবেষণার বিষয়।

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে অনেক সময় দেশ প্রেমকে (Patriotism) যুদ্ধরত জাতীয়তাবাদের একটা অংশ বলে মনে হয়। জর্জ আরওয়েলের ভাষায় Nationalism বা জাতীয়তাবাদ হচ্ছে Loyalty and devotion to a nation; especially; a sense of national consciousness exalting one nation above all others and placing primary emphasis on promotion of its culture and interests as opposed to those of other nations and supernational groups.

অপরাপর জাতিসমূহকে ছোট গণ্য করে নিজের পিতৃভূমির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের মধ্যে কেউ কেউ দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি দেখতে পায়। তাদের দৃষ্টিতে বিদেশীরা মনুষ্য পদবাচ্য নয় অথবা তারা মানুষ হলেও অস্পৃশ্য বা ছোট জাতের। অতীতে দেশপ্রেমের এই বর্ণবাদী ধারণা বিশ্বে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ইহুদী ও নাৎসিরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক দেশপ্রেমিকের মধ্যেও এ ধরনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত নিজ দেশের প্রতি আসক্তি বা ভালবাসা এবং ভিন দেশের প্রতি ঘৃণা অথবা নিজ দেশের যারা সরকারি দলের লুটপাট কিংবা বিতর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতির-বিরোধিতা করে তাদের শত্রু গণ্য করার নাম দেশ প্রেম নয়। Edward Abbey'র মতে If patriotism has any value it would be as a friendly competition between equals who have the same rights where one hopes that

www.pathagar.com

all competetors do well but hopes that his side does the best. A patriot must always be ready to defend his country not only against foreign aggressors but also against his government.

রাষ্ট্র ও দেশপ্রেম

কোন কোন দেশের দেশপ্রেমের লালন ও পরিপুষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে My country right or worng এই ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করা হয়। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত জওহর লাল নেহেরু এই অঞ্চলে এই মতামতের উদ্ভাবক ছিলেন। নীতি ও নৈতিকতার দিক থেকে এই মতবাদটি সর্বজন গ্রাহ্য নয়। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ একে বিকারগ্রস্ততা বলে অভিহিত করেন। Senator Carl Schulz এই শূন্যগর্ভ মতবাদের বিপরীতে দেশপ্রেমের আরেকটি ধারণা পেশ করেছেন। তার ধারণাটি হচ্ছে My country right or wrong, if right, to be kept right, if wrong to be set right.

ন্যায়-অন্যায় যা করি আমরাই সঠিক, আমাদের যারা বিরোধিতা করে তারা দেশের শত্রু, আমাদের শত্রু এই ধারণাটি সুস্থ মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। এর ফলে ধ্বংস ও বিপর্যয় নেমে আসে, মানবতার অবমাননা হয়। জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে এই ধারণাটি যখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপ্তি লাভ করে তখন মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক ঘোষিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার দেশগুলোর প্রতি You are either with us or against us ধরনের হুমকিমূলক আহ্বান এবং এর পরিণতিতে মার্কিন নেতৃত্বে মিত্র দেশগুলো কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাকের ন্যায় মুসলিম অধ্যুষিত দু'টি দেশে ধ্বংসযজ্ঞের অনুষ্ঠান অন্ধ দেশপ্রেমের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাধারণ মানুষকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, এর মধ্যে সরকারের প্রতি আনুগত্যের শপথ, পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের এসেমব্লি, স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, প্রেসিডেন্ট এবং শাসনতান্ত্রিক পদধারী ব্যক্তিরা রাষ্ট্র, সংবিধান ও আইনের

www.pathagar.com

প্রতি অনুগত থাকার যে শপথ বাক্য পাঠ করেন তা দেশপ্রেম বহাল রাখারই একটা পদ্ধতি বা কৌশল।

রাষ্ট্রীয় ভূমিকার প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেম সম্পর্কে স্যামুয়েল জনসন অত্যন্ত তিক্ত মন্তব্য করেছেন, তার ভাষায়, "The merits of patriotism are dubious at best. As practiced the kindest description is that patriotism is a national Psychosis where those who suffer from it can no longer determine right from wrong, and advocate that state commit barbaric atrocities in their name. As with all other mental derangements, those who suffer from its delusional effects should not be encouraged to continue or spread their disease but seek qualified help to overcome their impairment."

স্যামুয়েল জনসনের হতাশার কারণ সুস্পষ্ট। কোন কোন রাষ্ট্র দেশপ্রেমকে অন্যায়-অবিচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। কোনও বিশেষ ইস্যু সম্পর্কিত সরকারের নীতি পলিসির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সমালোচনা বন্ধ করার জন্য দেশপ্রেমকে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যমান অবস্থায় অনেকেই মনে করেন যে দেশপ্রেম স্বাধীনতা ও অবাধে মতামত প্রকাশের শত্রু। তবে প্রকৃত দেশপ্রেম ও দেশপ্রেমিকরা এ ধরনের সমালোচনার উর্ধ্বে। একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক তার দেশের সরকার এবং নেতৃবৃন্দের কাজ কর্মের ব্যাপারে সর্বদা প্রশ্ন তুলবেন। স্বাধীনতাপ্রিয় প্রত্যেকটি মানুষ অবহিত রয়েছেন যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সরকারই হচ্ছে স্বাধীনতার বড় হুমকী; চলা ফেরা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা বিবেক ও বাক স্বাধীনতা তার হাতেই বেশি বিপন্ন হয়, বিদেশী রাষ্ট্রের কোনও নাগরিকদের হাতে নয়। আবার ক্ষমতায় থাকার জন্য কিংবা সংকীর্ণ দলীয় ও আর্থিক স্বার্থে এ ধরনের সরকারই বিদেশী শক্তির হাতে দেশের সার্বভৌমত্ব তুলে দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

মোদ্দা কথা হচ্ছে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কল্যাণকর, স্বার্থহীন যে কোনও কর্মকান্ড দেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেশের জন্য জীবনের ঝুঁকি নেয়া, সৈন্যদের রসদ ও অস্ত্র যোগানে সাহায্য করা এবং

www.pathagar.com

তাদের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা চালানো প্রভৃতি হচ্ছে দেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য কিছু দিক।

দেশপ্রেমের রাজনৈতিক অপব্যবহার কিভাবে বিপদ ডেকে আনে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে এডলফ হিটলার। ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে তিনি ক্ষমতা দখল করেন এবং ডিক্টেটারে পরিণত হন। তার দেশপ্রেমের অন্ধত্ব, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদ এবং সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদী ধ্যান ধারণা ও অহংবোধ, প্রতিবেশী দেশসমূহের উপর আক্রমণ ও জবর দখল সারা দুনিয়াকে যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ঠেলে দেয়। নিজ দেশের ভূখন্ড সম্প্রসারণ আধিপত্য বিস্তার অথবা সম্পদ বা বাজার দখলের জন্য অন্য দেশের উপর হামলা দেশপ্রেম নয়। মাইক ওয়াজদিনের ভাষায়,

"Patriotism embodies two things: selflessness, which virtually everyone admires, plus a belief that we owe a greater allegiance to our fellow citizens than to ourselves, or a foreign countrymen", অর্থাৎ দু'টি উপাদান নিয়ে দেশপ্রেম গঠিত। একটি হচ্ছে, নিঃস্বার্থপরতা যা কার্যত সকলেই ভালবাসেন। আরেকটি হচ্ছে এই বিশ্বাস বা ধারণা যে আমাদের নিজের বা বিদেশীদের তুলনায় আমাদের দেশের মানুষের প্রতি অধিকতর আনুগত্য এবং দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। বিদেশীদের তুলনায় দেশের মানুষ অধিকতর প্রিয় ও কাছের কিনা বাস্তব জীবনে প্রায়শঃই এই প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে হয়। এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অনেক দেশের অভিবাসন আইন অনুযায়ী নিছক জন্ম সূত্রেই কোনও ব্যক্তি একটি দেশের নাগরিক হতে পারেন এবং সকল প্রকার নাগরিক সুবিধা পাবার যোগ্য বিবেচিত হন। কিন্তু বিদেশীরা তা পান না। অবশ্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং দেশের মানুষের প্রতি আনুগত্য ও দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যবধান নিয়ে সর্বত্র বিতর্ক রয়েছে। এর অবসানের চেষ্টাও চলছে।

সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে জন্ম না হলেও কোনও ব্যক্তি সে দেশের প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেমিক হতে পারেন না অথবা সে দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারেন না তা নয়। ভিন দেশে জন্ম গ্রহণ করেও অন্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় লড়াই করেছেন অথবা প্রাণ দিয়েছেন ইতিহাসে এর অনেক নজির রয়েছে।

www.pathagar.com

Marquis de Lafayette নামক একজন ফরাসী বীর আমেরিকার ১৩টি বৃটিশ কলোনীর স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। দেশাত্মবোধক কাজকে দু'ভাগে দেখা যায়, বিস্তৃত অর্থে এ হচ্ছে এমন একটি কাজ যার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থ নেই এবং যা থেকে রাষ্ট্র উপকৃত হয়। সংকীর্ণ অর্থে বিশেষভাবে দেশপ্রেমের অনুভূতি থেকে উৎসারিত নিঃস্বার্থ যে কোন কাজই হচ্ছে দেশাত্মবোধক কাজ।

দেশপ্রেমের অনুভূতি সম্পর্কে দার্শনিক Alasdair MacIntyre 'Is Patriotism a Virtue' শীর্ষক গবেষণা পত্রে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার ভাষায় "One explanation that has been proposed is that such feelings result in the long run, from kin selection. Our ancestors certainly lived in small groups of genetically related individuals. Feelings of intense loyalty to one' own group might have led individuals to take actions that were poorly justified on grounds of self interest but helped the group as a whole. Since genes tend to have been shared by the entire group, and cooperation likely was critical to group survival, a propensity to experience feelings of loyalty to the group was probably favoured by natural selection." Alasdair-এর এই ব্যাখ্যাটিতে ডারউইনের থিওরীর উপাদান পাওয়া যায়। এখানে রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক দেশপ্রেমের মানদণ্ড। এর বাইরে আদর্শের সম্পর্ক যে দেশপ্রেমের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক তা তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়।

দেশপ্রেমের পরিমাপ

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে দেশপ্রেম পরিমাপের লক্ষ্যে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনার নজির রয়েছে। সরকারের নীতি পলিসির সংস্কার বা পুনর্গঠন ছিল এই সমীক্ষাসমূহের মূল উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর The Correlates of War Project নামক ইউরোপীয় দেশসমূহের একটি প্রকল্পের তরফ থেকে এ ধরনের একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এই সমীক্ষা যুদ্ধের তীব্রতার সাথে দেশপ্রেমের একটা সম্পর্ক চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়।

আবার এও দেখা গেছে যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন হয়। এক সমীক্ষা অনুযায়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানদের

www.pathagar.com

দেশপ্রেম ছিল তুঙ্গে। কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী তাদের অবস্থা এখন সর্ব নিম্নে এসে পৌঁছেছে। World Value Survey এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দেশপ্রেমের স্কোর বা মাত্রা সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। "আপনি কি আপনার দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে গর্বিত" এই প্রশ্নের উত্তরকে ভিত্তি করে এই রিপোর্টটি তৈরী করা হয়েছে এবং এর স্কোর সর্বনিম্ন ১ (গর্বিত নই) থেকে সর্বোচ্চ ৪ (অত্যন্ত গর্বিত) পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সমীক্ষার প্রাপ্ত গড় দেশওয়ারী ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

দেশের নাম	১৯৯০-১৯৯২ সালের সমীক্ষার স্কোর	দেশের নাম	১৯৯৫-১৯৯৭ সালের সমীক্ষার স্কোর
আয়ারল্যান্ড	৩.৭৪	ভেনেজুয়েলা	৩.৯২
যুক্তরাষ্ট্র	৩.৭৩	দক্ষিণ আফ্রিকা	৩.৭৩
ভারত	৩.৬৭	ভারত	৩.৭২
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩.৫৫	যুক্তরাষ্ট্র	৩.৭০
কানাডা	৩.৫৩	পেরু	৩.৬৮
স্লোভেনিয়া	৩.৪৬	স্লোভেনিয়া	৩.৬৪
স্পেন	৩.২৮	পোল্যান্ড	৩.৫৫
ডেনমার্ক	৩.২৭	অস্ট্রেলিয়া	৩.৫৪
ইতালি	৩.২৫	স্পেন	৩.৪০
সুইডেন	৩.২২	চিলি	৩.৩৮
ফ্রান্স	৩.১৮	আর্জেন্টিনা	৩.২৯
ফিনল্যান্ড	৩.১৭	সুইডেন	৩.১৩
		মলডোভা	২.৯৮
বেলজিয়াম	৩.০৭	জাপান	২.৮৫
নেদারল্যান্ড	২.৯৩	রাশিয়া	২.৬৯
জার্মানী	২.৭৫	সুইজার্যান্ড	২.৫৯
গড়	৩.২৬	লিথুয়ানিয়া	২.৪৭
		লাটভিয়া	২.১০
		জার্মানী	১.৩৭
		গড়	৩.১২

উপরোক্ত রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে কোনও পরিসংখ্যান নেই। এ প্রেক্ষিতে এদেশের মানুষের দেশপ্রেমের স্কোর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য

www.pathagar.com

করা কঠিন। তবে যেহেতু সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে অগণিত মানুষের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জতের বিনিময়ে এই দেশটি অর্জিত হয়েছে সেহেতু স্বাভাবিকভাবে ধরে নেয়া যায় যে, আমাদের দেশপ্রেমে খাদ বা ঘাটতি নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন প্রথম ওপি ওয়ানের মাধ্যমে অভিবাসন কর্মসূচি শুরু করেছিল তখন বাংলাদেশ থেকে এক কোটি যুবক সে দেশের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছিল। এই অবস্থা দেখে কেউ কেউ তাদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমি তাদের এই আচরণকে দেশপ্রেম বর্জিত কোনও পদক্ষেপ বলে মনে করি না বরং জীবিকা অর্জনের উৎস সন্ধানের প্রয়াস হিসেবে দেখি। অভিবাসন পেলেও তারা জন্মভূমির খেদমত করতে পারেন। এতে কোনও বাধা থাকার কথা নয়।

দেশপ্রেমের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কুরআন সুন্নাহ নির্দেশিত ইনসাফ ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা, উলুল আমর এর আনুগত্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, জনগণের সংশোধন এবং আমর বিল মা'রুফ ও নেহি আনিল মুনকারের নীতিমালার প্রয়োগ, ইসলামী আইন ও দণ্ডের বিধান কার্যকরকরণ এবং জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ প্রভৃতি হচ্ছে ঈমানদার প্রত্যেকটি মানুষের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি ভূখন্ডের প্রয়োজন। এটি পিতৃভূমি, মাতৃভূমি অথবা Place of domicile হতে পারে। এই ভূখণ্ডের প্রতি ভালবাসা, তার বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল প্রকার সামরিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করা প্রত্যেকটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। এক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে দেশপ্রেম। এই দেশ প্রেমের ভিত্তি আল্লাহর মহব্বত, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপরের প্রতি মহব্বত (হুব্বুন ফীল্লাহ), আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শরিয়া নির্ধারিত পন্থায় অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ (বুগদুন ফীল্লাহ), রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মহব্বত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে শ্রেষ্ঠ জানা এবং উসওয়ায়ে হাসানা বলে মানা, ইখলাস বা আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা, আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা, সবর এবং আল্লাহভীরুতা। এখানে অন্ধ প্রেমের কোনও সুযোগ নেই।

এ ব্যাপারে সূরা আল আনয়ামের ১৬২ নং আয়াত প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে, "বলোঃ আমার নামাজ, আমার কুরবানী, আমার

www.pathagar.com

জীবন, আমার মরণ শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, তার কোনও শরিক নেই।"

সূরা আল-বাকারার ১৬৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মুমিনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসে। এই ভালবাসা এত প্রবল ও সুদৃঢ় যে অন্য কোনও ভালবাসা অথবা ভীতি তাদেরকে এক বিন্দুও টলাতে পারে না।"

কুরআন মজীদে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সূরা আল মুজাদিলার ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তুমি (মুহাম্মদ) (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকদের এমন কখনও দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতাকারীদের প্রতি তারা ভালবাসা পোষণ করে। যদিও (ঐ সব বিরোধিতাকারীরা) তাদের পিতা-মাতা হোক, সন্তানদি হোক, ভাই বেরাদার হোক কিংবা বংশ পরিবারের লোক হোক। এরা সেই সমস্ত লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন এবং নিজের তরফ থেকে একটা রুহ দান করে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। ..... এরাই হচ্ছে আল্লাহর দলের লোক।" সূরা আল ইমরানের ২৮নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা অপর মুমিন ছাড়া কাফিরদের কখনো পৃষ্ঠপোষক বানায় না।"

সূরা আল হুজুরাতের ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "প্রকৃত মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে পড়ে না এবং নিজেদের জ্ঞান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। এরাই (তাদের ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী।"

সূরা আত্ তাওবার ৭১নং আয়াতে বলা হয়েছে, "মুমিন নারী ও পুরুষের আরো বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা পরস্পরের বন্ধু, সাহায্যকারী। তারা একে অপরকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য করে....।"

গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী দেশপ্রেম

www.pathagar.com

কুরআন সুন্নাহর আদর্শকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, ভূখণ্ডের পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে না। আল্লামা ইকবাল তার কবিতায় এরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি বলেছেন, "চীন ওয়া আরব হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা, মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতন, সারা জাঁহা হামারা।" অবশ্য আধুনিককালে পরিচয়ের জন্য আদর্শভিত্তিক জাতীয়তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে এদেশের মুসলিমরা গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং তার ভিত্তিতে তাদের দেশপ্রেম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে দেশপ্রেম : একটি পর্যালোচনা

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বিশাল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত একটি জনপদ হিসেবে বাংলাদেশ ভূখণ্ডটি যুগযুগ ধরে সুপরিচিত হলেও মীর জাফরের ন্যায় বিশ্বাস ঘাতকের সংখ্যাও এই অঞ্চলে কখনো কম ছিল না। ব্যক্তি স্বার্থে গোষ্ঠী ও জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার নজির এখানে প্রচুর রয়েছে। দেশপ্রেম এখানে জোয়ার ভাটার ন্যায় কখনো ভরা কাটাল কখনো মরা কাটালের রূপ ধারণ করেছে। মীর জাফর, জগৎশ্রেষ্ঠ, উমি চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার কাছে দেশপ্রেম পরাভূত হবার পর এই ভূখণ্ডটি বৃটিশ বেনিয়া শক্তির কবলেই শুধু যায়নি বরং তাদের ভারত বর্ষ দখলের গেটওয়ে হিসেবেও কাজ করেছে। ফলে প্রায় পৌনে দু'শ বছর ধরে আমরা বৃটেনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গোলামী করতে বাধ্য হই। দেশী বিশ্বাসঘাতক ও বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তির শোষণ নির্যাতনের ধকল সামলিয়ে এদেশের দেশ প্রেমিক শক্তির মেরুদণ্ড খাড়া করে প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠনে প্রায় ১০০ বছর সময় লাগে এবং ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি ঘটে। কিন্তু আবারও শিখ এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠীর বিশ্বাস ঘাতকতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রযাত্রা রূদ্ধ হয়ে যায়। মঞ্জিলে পৌঁছাতে আরো ৯০ বছর সময় লাগে। এ পথেও বাধা আসে। এই বাধা ডিঙ্গিয়ে ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করি। বাংলাদেশ অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত হয় এবং ১৯৭১ সালে নয় মাস ব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর এই সময়টা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের জন্য মহা সংকটকাল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের

www.pathagar.com

অধিবেশন স্থগিত ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রদেশব্যাপী যে অসহযোগ, হরতাল, অবরোধ, অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং অবাঙ্গালী জনপদের উপর যে অত্যাচার-অবিচার শুরু হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান আর্মীর নির্মম ক্র্যাকডাউন সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে এনে দিয়েছিল অমানিশার অন্ধকার। তাদের জান, মাল ও ইজ্জতের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। যখন তখন গ্রেফতার, পাশবিক ও দৈহিক অত্যাচার এবং নির্যাতন পরিণত হয়েছিল নিত্যদিনের ভাগ্যলিপি। এই সময়টি ছিল দেশপ্রেমিকদের পরীক্ষা দেয়ার প্রকৃষ্ট সময়। সীমান্তপারে ভারত ভূখণ্ডে আশ্রয় প্রার্থী ৭৫.৫৬ লক্ষ শরণার্থী ব্যতীত বাকী ৭ কোটি বাঙ্গালী ছিল কার্যত সশস্ত্র হিংস্র পাকবাহিনীর হাতে বন্দী। এরা পাক বাহিনীর জুলুম সহ্য করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের আহার, আশ্রয় এবং অন্যান্য সহযোগিতা দিয়েছে। তারা আত্মত্যাগ করেছে, স্বজন হারিয়েছে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। ভারতপন্থী দলগুলো ছাড়া অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীরা তাদের সাহস জুগিয়েছে; পাক বাহিনীর হাত থেকে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতপন্থী দলগুলোর নেতা-নেত্রীরা দেশবাসীকে তোপের মুখে ঠেলে দিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাথে সে দেশে প্রাণ ভয়ে শরণার্থী হয়েছিল ৭৫.৫৬ লক্ষ লোক, সাম্প্রদায়িক বিভাজন অনুযায়ী যাদের মধ্যে ছিল ৬৯.৭১ লক্ষ হিন্দু, ৫.৪১ লক্ষ মুসলিম এবং ০.৪৪ লক্ষ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক। প্রবীণ রাজনীতিবিদ জাতীয় লীগ প্রধান অলি আহাদের ভাষায়,

"ভাগ্যের কি পরিহাস, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এদেশের মৃত্যুঞ্জয়ী সাত কোটি মানুষ মুহূর্তের মধ্যে ভারতের আশ্রয় প্রার্থী শরণার্থীদের দৃষ্টিতে পাক বাহিনীর সহযোগী রূপে অভিযুক্ত হয় এবং এক পলকে পরিণত হয় এক অচ্ছ্যুৎ শ্রেণিতে। আরো পরিতাপের বিষয় ১৬ ডিসেম্বরের পরে অনুষ্ঠিত অত্যাচার, অবিচার, লুটপাট, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ-নির্যাতন ১৬ ডিসেম্বরের আগেকার মতই সমভাবে শহর নগর গ্রামের বাঙ্গালী জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। ভারত প্রত্যাগত মুষ্টিমেয় শরণার্থী ছিল এর জন্য দায়ী।" দেশপ্রেমের দলীয়করণ এ ক্ষেত্রে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলকে ভারসাম্যহীন করে তোলে এবং তারা সারা জাতিকে

www.pathagar.com

স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ এই দুটি শক্তিতে বিভক্ত করে নেয়। আওয়ামী লীগ, ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরোধিতাকারী এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারকেও রাজাকারে পরিণত করে। দেশপ্রেম একটি বিশেষ দলের পৈত্রিক সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। কাগজে কলমে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পেলেও কার্যত তা ভারতের বশংবদ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলেও অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ভারতের মাটি থেকে ঢাকায় পদার্পণ করেন ২০ শে ডিসেম্বর। বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীসহ তাদের কেউই পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। ভারতে আশ্রয় থেকে স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সরকার ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারি এক আদেশ বলে বাংলাদেশের মুদ্রামান ৬৬ শতাংশ হ্রাস করেন। পাশাপাশি একই তারিখ থেকে ভারতীয় ও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক ঘোষণা করা হয় এবং দেশীয় পাটকলের স্বার্থে এতদিন পর্যন্ত ভারতের কাছে পাট বিক্রির উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশ এবং ভারত পাট, চা, চামড়া বিক্রির ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী ছিল। সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশের পাট, চা ও চামড়া শিল্পে অন্ধকার নেমে আসে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের শতকরা ৯০ ভাগ ছিল কাঁচা পাট ও পাট জাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল। পাটের বাজার উন্মুক্ত করে দেয়ায় এবং পাশাপাশি সীমান্ত খুলে দেয়ায় বৈধ ও অবৈধ উভয় পথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাট পাচার ও রফতানি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ভারতের যে সমস্ত পাট কল ২০/২২ বছর ধরে বন্ধ ছিল কিংবা ক্যাপাসিটির এক চতুর্থাংশও উৎপাদনে সক্ষম হচ্ছিল না সে পাটকলগুলো এতে পুনরায় পূর্ণ ক্যাপাসিটিতে চালু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শ্রমিক অসন্তোষ, কাঁচা মালের অভাব, গুদামে আগুন প্রভৃতি কারণে আমাদের পাট কলগুলো একের পর এক বন্ধ হতে থাকে এবং এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে ভারতের সাথে প্রতিযোগিতার সামর্থ্য ও যোগ্যতা উভয়টাই আমরা হারিয়ে ফেলি। আমাদের রফতানি আরও সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পায়। ফলে খাদ্যসামগ্রী, শিল্পের কাঁচামাল এবং জীবন রক্ষাকারী ওষুধপত্র আমদানিও কঠিন হয়ে যায়। ভারতীয় সিকিউরিটি প্রেস

www.pathagar.com

থেকে মুদ্রিত বাংলাদেশী নোটের সংখ্যা সরকার ঘোষিত সংখ্যা থেকে অনেক বেশি বলে প্রমাণিত হয় এবং এ প্রেক্ষিতে সরকার এই নোট অচল ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে এই সিদ্ধান্তের একটা অভিনব ও বিস্ময়কর দিক ছিল এই যে, সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষনার পরও ভারতে মুদ্রিত নোট বদলানোর সুযোগ দু'মাস পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হয়। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সাধারণ মানুষের চোখেও ধরা পড়ে। বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রকট মুদ্রাস্ফীতির শিকারে পরিণত হয়। বাজারে এর অভিব্যক্তি ঘটে বিস্ময়করভাবে। কেনা কাটায় ভারতীয় মুদ্রার অবাধ প্রচলন শুরু হয়। ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং ভারতের সাধারণ নাগরিকরা বাংলাদেশের বাজার থেকে দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রীত বিদেশী পণ্য সামগ্রীসহ কয়েকশ' কোটি টাকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে ভারতে নিয়ে যায়। এছাড়াও ভারতের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন কলকারখানা থেকে শত শত কোটি টাকার মেশিন পত্র ও যন্ত্রপাতির খুচরা অংশ, কাঁচামাল প্রভৃতি পাচার করে নিয়ে যায়। দুনিয়ার ইতিহাসে বহু রাষ্ট্র বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য-সহায়তায় স্বাধীনতা অর্জন করেছে; কিন্তু কোনও রাষ্ট্র কর্তৃক তার কাগজী নোটের বিনিময়ে অর্থাৎ বিনামূল্যে সংঘবদ্ধ প্রতারণার মাধ্যমে লুটপাট করে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রকে এইভাবে নিঃস্ব করার নির্দয় নজির আর কোথাও নেই। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারে যারা ছিলেন তারা এ দেশের মাটির সন্তানই ছিলেন, কিন্তু তারা এদেশে বেআইনীভাবে ভারতীয় কাগজী মুদ্রা প্রচলনে বাধা দেন নাই। দেশ বিক্রিতে তাদের বাধেনি। ৯৩০০০ যুদ্ধবন্দী বাংলাদেশ থেকে সোনা দানা সহ যে দামী দ্রব্য-সামগ্রী লুট করে আত্মসাৎ করেছিল ভারতীয় সেনা বাহিনী তাদের কাছ থেকে সেগুলোও ছিনিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছে এবং তাদের পরিবার পরিজনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানী সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্র-সস্ত্রও ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশকে দেয়নি, ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ভারতীয় দৈনিক অমৃত বাজারে ১৯৭৪ সালের ১২ মে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত সরকার পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্য থেকে দুই থেকে আড়াই শ' রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্র-শস্ত্র ভারতে স্থানান্তরিত করেছে এবং এতে বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি ছিল। এ ছাড়াও মহা চীন কর্তৃক নির্মিত জয়দেবপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী থেকে ভারতীয় সৈন্যরা শত শত কোটি টাকার অস্ত্র, নির্মাণ

www.pathagar.com

সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ভারতে নিয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত চিনি কল, বস্ত্র কল ও পাট কলের যন্ত্রপাতি পাচার তো ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। যারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তৎকালীন সরকারের দৃষ্টিতে তারা হয়ে পড়েছিলেন দেশের শত্রু। এই প্রতিবাদের কারণে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলকে গ্রেফতার করে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল।

বলাবাহুল্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ভারতে অবস্থানকালে স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার বিনিময়ে ভারত সরকারের সাথে সাতটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই চুক্তিগুলোর বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ :

১। ভারতীয় সমরবিদদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করা হবে। গুরুত্বের দিক থেকে এবং অস্ত্র-শস্ত্র এবং সংখ্যায় এই বাহিনী মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় এবং তাৎপর্যপূর্ণ হবে (যেমন, রক্ষী বাহিনী)।

২। ভারত থেকে সমরোপকরণ এবং অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করতে হবে এবং ভারতীয় সমরবিদদের পরামর্শের ভিত্তিতে তা করতে হবে।

৩। ভারতীয় পরামর্শেই বাংলাদেশের বহিঃবাণিজ্য কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে।

৪। ভারতীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৫। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অনুরূপ হবে।

৬। ভারতের সম্মতি ছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত কোনও চুক্তি বাতিল করা যাবে না।

৭। ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোনও সময় যে কোন সংখ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে বাধাদানকারী শক্তিকে চুরমার করে দেয়ার অধিকার তার থাকবে।

উপরোক্ত চুক্তিগুলো প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ স্বাক্ষর করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সাতটি চুক্তি ঈষৎ পরিমার্জিত রূপে

www.pathagar.com

১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ ঢাকার বুকে বঙ্গভবনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত ২৫ সালা 'বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও শান্তি' চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দেশের সকল রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করেছিল। তৎকালীন সরকার দেশের স্বার্থের পরিপন্থী ও জাতিদ্রোহী অবস্থান থেকে এক চুলও নড়তে রাজি ছিলনা এবং চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে পার্লামেন্টের বা বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণেরও প্রয়োজন বোধ করেনি।

ভারতকে মরণ বাঁধ ফারাক্কা চালুর অনুমতি প্রদান ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের ঘৃণ্যতম কাজগুলোর অন্যতম। এই বাঁধ চালু করার ফলে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবার ঝুঁকিতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে পদ্মা ও তার অববাহিকা অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যায়, গাছ-পালার পুষ্টি উপাদানে সংকট দেখা দেয় এবং আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব বিপদসীমা অতিক্রম করে। লোনা পানির প্রাদুর্ভাবও বেড়ে যায় এবং এর ফলে উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট মিল খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলসহ বাংলাদেশের হাজার হাজার শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে যায়। শীত মওসুমে পদ্মার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও গোদাগাড়ি পয়েন্টে এখন লঞ্চ, স্টীমারের পরিবর্তে গরুর গাড়ী চলে। নদী এখন চর। এছাড়াও ১৯৭৪ সালের ১৬ মে মুজিব ইন্দিরার মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বেরুবাড়ী ভারতের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু তার পরিবর্তে তিন বিঘা করিডোরসহ বাংলাদেশের পাওনা ছিট মহলগুলোতে অদ্যাবধি আমাদের দখল ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিজ ভূখণ্ড বিদেশের হাতে তুলে দেয়া, স্বাধীন একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার বিসর্জন ও তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দান দেশ প্রেমের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা তা অবশ্য পরীক্ষা সাপেক্ষ ব্যাপার।

সন্দেহ নেই আওয়ামী লীগ দেশপ্রেমের দাবীদার একটি রাজনৈতিক দল। কিন্তু স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের ছিনতাই, লুণ্ঠন, পাচার, হত্যা, গুম ও ব্যভিচার দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সরকারের ব্যর্থ প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক পলিসি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে

www.pathagar.com

ভারতীয় অর্থনীতির যোগানদার অর্থনীতিতে পরিণত করে। পণ্য দ্রব্যের মূল্য ক্রেতা সাধারণের নাগালে বাইরে চলে যায়। ক্ষেত, খামার ও কলকারখানায় উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয়, কলকারখানা ও কাঁচা পাটের গুদামে শুরু হয় অগ্নিসংযোগ ও স্যাবোটেজ। সর্বত্র দেখা দেয় খাদ্যসামগ্রী ও পণ্যদ্রব্যের তীব্র অভাব। ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে দুর্ভিক্ষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে লক্ষ লক্ষ লোক। বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্দ করার লক্ষ্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন, জন নিরাপত্তা আইন প্রভৃতি প্রণয়ন ও নির্বিচার প্রয়োগ পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার উচ্চ মার্গে পৌঁছে। কিন্তু তাতেও এই দলের ক্ষমতা লিপ্সা শেষ হয়নি। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানে চতুর্থ সংশোধনী সংযোজনের মাধ্যমে সারা দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে বাকশাল নামক একটি মাত্র দল প্রতিষ্ঠা করা হয়। দু'টি সরকার দলীয় ও দু'টি সরকারি মালিকানাধীন পত্রিকা ছাড়া আর সকল দৈনিক পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রবীণ রাজনীতিক অলি আহাদের ভাষায়, "ক্ষমতার লোভ, এক শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী, নীতিহীন বুদ্ধিজীবী ও চরিত্রহীন টেন্ডলের যোগসাজশে বাংলার সর্বত্র নগরে, বন্দরে, কলকারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, ক্ষেতে খামারে দিল্লীর দাসেরা আওয়াজ তুলতে থাকে, এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।"

এখানে স্মরণ করা দরকার যে ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক বিপ্লবের পূর্বে নোয়াখালীর রামগতির তোরাবগঞ্জে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছিল। এতে এর আরোহী দু'জন সিনিয়র ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছিল। পরদিন বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টারযোগে এই দুই ভারতীয় কর্মকর্তার মৃতদেহ কোলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাংলাদেশের আকাশ সীমা লংঘন করে প্রতিবেশী দেশের একটি সামরিক হেলিকাপ্টারের এত অভ্যন্তরে এসে বিধ্বস্ত হবার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত রহস্যজনক। ভারতীয় দৈনিক আনন্দবাজার ও আজকাল বার বার সে দেশের সরকারের কাছে এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়েও কোনও উত্তর পায়নি। বাংলাদেশের তরফ থেকেও এ ঘটনার উপর কোনও মন্তব্য বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তবে কূটনৈতিক বাধা, সরকারি

www.pathagar.com

নিষেধাজ্ঞা এবং গোয়েন্দা বিধি-নিষেধ অতিক্রম করে যে গোপন তথ্যটি পরবর্তী কালে বেরিয়ে এসেছিল তাতে দেখা যায় যে, ঐ হেলিকপ্টারের আরোহীরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামরিক দলিল বহন করছিলেন। এই দলিল অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে তাকে আগরতলা ভিত্তিক ভারতীয় বাহিনীর কম্যান্ডে ন্যস্ত করার প্রস্তাব ছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন সেনা প্রধান এই দলিলে স্বাক্ষর করার পর হেলিকপ্টার আরোহীরা আগরতলা কমান্ড এর কাছ থেকে প্রতিস্বাক্ষর করে কোলকাতা ফিরছিলেন বলে জানা যায়। ইতোমধ্যে ঢাকা সেনানিবাস ও বিমানবাহিনী হেড কোয়াটারের দেশ প্রেমিক কর্মকর্তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হন এবং দেশ এবং সেনাবাহিনীকে রক্ষার জন্য হেলিকপ্টারটি ভূপাতিত করে সমস্ত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। এই প্রেক্ষাপটে ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তন ঘটে। এতে দেশ ভারতীয় আধিপত্যবাদ থেকে যেমন মুক্ত হয়েছিল তেমনি গণতন্ত্রও ফেরত পেয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা যে লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছিল তারও অবসান ঘটেছিল। তখনকার দিনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে মাহবুবুল আলম চাষী যথার্থই বলেছেন, "Many of the freedom fighters, who were once eager to sacrifice their lives for the cause of their motherland, were now trying to devour the entire nation. Excesses committed by them made normal work nearly impossible. Situation became so unmanageable that once a leader of a foreign delegation asked me whether the country was really liberated or it was conquered. I wanted to know why she asked this question. She told in reply that in a liberated country every body felt safe and happy, while in a conquered country, people were afraid and conquerers looted and plundered the conquered land. In her opinion the general condition in Bangladesh was closer to the latter."

অর্থাৎ 'মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই যারা এক সময় মাতৃভূমির জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিল তারা এখন গোটা জাতিকে গিলে খাবার জন্য উদ্যত হয়ে পড়তে দেখা গেল, তাদের বাড়াবাড়ির ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম

www.pathagar.com

চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়লো, পরিস্থিতির এতই অবনতি ঘটলো যে, একবার বিদেশী এক প্রতিনিধি দলের নেতা আমাকে প্রশ্ন করেই বসলেন যে, এই দেশটি আসলে কি স্বাধীন করা হয়েছে না দখর করা হয়েছে। আমি তার এই প্রশ্নের কারণ জানতে চাইলাম, তিনি বললেন যে, স্বাধীন একটি দেশে প্রত্যেকটি লোক নিরাপদ থাকে এবং নিজেকে সুখী ও পরিতৃপ্ত বোধ করে। পক্ষান্তরে বিজিত বা দখলকৃত একটি দেশের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত থাকে এবং বিজেতারা বিজিত দেশে লুটপাট চালায়। তার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অবস্থা শেষোক্ত দেশের অবস্থার খুবই কাছাকাছি।' জনাব চাষীর এই উদ্ধৃতি থেকে বিদেশীদের কাছে তৎকালীন বাংলাদেশের ইমেজ সম্পর্কে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। ১৯৭৫ সালের ১৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ পরিস্থিতির উপর বিএসএফ এর গোলক মজুমদার কর্তৃক ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব শ্রী রুস্তমজীকে লেখা এক গোপনীয় পত্রেও অনুরূপ একটি চিত্র পাওয়া যায়। এতে তিনি বলেছেন, "Conditions continue to be difficult in Bangladesh. Salt sells at Tk. 100.00 per seer while the cost of mustard oil is Tk. 250.00 per seer. The general public has become disgusted with corruption amongst high officials and politicians. Some sections have started openly questioning the competence of Sheikh Mujibur Rahman to administer the country. The opposition forces are trying hard to put up a strong front against the Awami League and armed clashes are not at all uncommon, specially in the country side. Quite a few police and army posts have been attacked and daring decoity have taken place in Dacca in broad day light. Students are becoming restive. There is a tendency to blame India for all ills of Bangladesh and in the process communal feelings are developing quite fast. Hindus are becoming more and more frustrated and there is a growing feeling amongst them that they are not wanted in

www.pathagar.com

Bangladesh." রুস্তমজীকে লেখা গোলক মজুমদারের এটিই একমাত্র পত্র নয়, আরো অসংখ্য পত্রে তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের অবস্থা তুলে ধরেছিলেন যা কোন ক্রমেই সুখকর ছিল না।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচরণ, মানবাধিকার লংঘন, গণতন্ত্র হত্যা ও অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে এ দেশের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে জানমাল কুরবানী করেছে। তাদের রক্তের সাথে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশ শাসন করেছেন, লুটপাট, অত্যাচার, নিপীড়ন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংসে পাকিস্তানীদেরও ছাড়িয়ে গেছেন তাদের দেশপ্রেমের স্কোর অবশ্য নির্ণিত হয়নি।

স্বাধীনতার হিফাজত ঃ কিছু করণীয়

১। স্বাধীনতা অর্জনের তুলনায় স্বাধীনতার হেফাজত বা সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন একটি কাজ। এজন্য প্রয়োজন জাতির ইস্পাত কঠিন ঐক্য। সংকীর্ণ স্বার্থ, রাজনৈতিক ঈর্ষা-বিদ্বেষ, ক্ষমতার লোভ ও বিদেশী শক্তির আনুগত্য এবং দালালি এই ঐক্যের পথে বড় অন্তরায়। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা ঐক্য বিনষ্ট করে। জাতীয় ঐক্য ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। ফিলিপাইনের জাতীয় বীর ড. রিজালের ভাষায় Why liberty if the slaves of today become the tyrants of tomorrow? রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, অত্যাচার, নির্যাতন, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ক্ষমতাসীন দলের সীমাহীন দলীয়করণ, রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও সুযোগ সুবিধার পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবহার জাতি প্রেম বা দেশাত্মবাবোধক কাজ নয়। এর ফলে জাতির মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি দেখা দেয়, পারস্পরিক আস্থাহীনতার জন্ম হয় এবং শত্রুরা উৎসাহিত হয়। দেশ রক্ষা এবং স্বাধীনতা হেফাজতের জন্য এই প্রবণতা রোধ করা অপরিহার্য।

২। ১৭৫৭ সালে মীর জাফর, জগৎশেঠ, উমি চাঁদের ন্যায় জনবিচ্ছিন্ন বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে বিদেশীদের

www.pathagar.com

কাছে দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিক্রির ফলে বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয় এবং ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষে পরাধীনতার অমানিশা নেমে আসে। এই স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পৌনে দু'শ বছরের সংগ্রাম প্রয়োজন হয়েছিল। এই সংগ্রামে কোটি কোটি মানুষকে অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। যারা বিশ্বাসঘাতক ও দালাল ছিল সংখ্যায় তারা ছিল হাতে গোনার মত। কিন্তু তাদের সংকীর্ণ স্বার্থের বলি যারা হয়েছিল তারা ছিল সংখ্যায় কোটি কোটি এবং বংশ পরম্পরায় প্রায় দু'শ বছর গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মীর জাফররা মরে না, তারা Recycled হয়। তাদের ক্ষমতা লিপ্সা এবং ষড়যন্ত্রও অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতার সুরক্ষার জন্য এদের মুখোশ উন্মোচনের শক্তিশালী ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে স্বাধীনতা নিরাপদ থাকতে পারে না। জনসচেতনতা ও জনগণের সতর্কতাই এর নিশ্চয়তা দিতে পারে।

৩। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্বের পেছনে এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আদর্শিক স্বকীয়তাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এই উপমহাদেশের হিন্দু এবং মুসলিম এই দু'টি জনগোষ্ঠী দু'টি স্বতন্ত্র সত্তা এবং আলাদা জাতি। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ভারত এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল এবং ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতেই গণভোটের মাধ্যমে বৃহত্তর সিলেট আসাম থেকে এবং পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা থেকে আলাদা হয়ে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়েছিল। জনগণের মৌলিক আকিদা বিশ্বাস তথা ইসলামী আদর্শই ছিল এক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধ্বংস সাধন, প্রাসাদ রাজনীতির ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, অবিচার এবং অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা ১৯৭১ সালে এই দেশের মানুষকে সশস্ত্র মুক্তি যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। পতাকার এই পরিবর্তন এবং নতুন এই দেশের সৃষ্টি দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করেনি বরং লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত

www.pathagar.com

অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের মূল ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে দ্বিজাতিতত্ত্ব তথা আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টি মুখ্য না থাকলে ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আদলে গঠিত আদর্শের ধারক বাহক হিসেবে তার থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের টিকে থাকার কোনও যৌক্তিকতা নেই। একটি মহল ইসলামকে গৌণ বিষয়ে পরিণত করে এ দেশে ভারতীয় আদর্শ চাপিয়ে দিতে চায়। সংবিধান থেকে পঞ্চম সংশোধনী বাতিল, রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস সম্পর্কিত ধারার অবলোপনের চেষ্টা এরই একটি অংশ। এই প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেয়া যায় না। এ ব্যাপারে দেশের মানুষ যাতে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করতে পারে তার জন্য দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোকে জনমত গঠনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৪। অরক্ষিত স্বাধীনতা দেশকে পরাধীনতার দিকে ঠেলে দেয়। আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ও বিকাশ স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসনের এই যুগে যদি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ভিত্তিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয় তাহলে আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। দেশের মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজ যদি আদর্শ বিচ্যুত হয়ে পড়ে তাহলে দেশ টিকে থাকতে পারে না। বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন রোধ করতে হলে নিজস্ব সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত শক্তিশালী গণমাধ্যম বিশেষ করে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সৃষ্টি করতে হবে এবং সেগুলো পরিচালনার জন্য আদর্শনিষ্ঠ জনবল তৈরী করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আহরণ এবং বুদ্ধি বৃত্তির কোনও বিকল্প নেই।

৫। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় সেনাবাহিনীর ভূমিকা অপরিসীম। আধুনিক যুদ্ধ বিদ্যার সর্বশেষ কৌশল এবং যথাসম্ভব সর্বোন্নত যুদ্ধ উপকরণে তাদের সমৃদ্ধকরণ ও সেগুলো ব্যবহারে উন্নতর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর অপরাপর সংস্থাগুলোকে অবশ্যই দলীয় প্রবাব এবং সংকীর্ণ

www.pathagar.com

রাজনীতির উর্ধ্বে রেখে তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। সেনাবাহিনীর দলীয়করণ কিংবা তাদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি তাদের বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং এর ফলে বিদেশী হামলা মোকাবিলা করা এবং স্বাধীনতার হেফাজত তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

স্বাধীনতার হেফাজতের জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেশপ্রেমকে উজ্জীবিত করা এবং দেশাত্মবোধক কাজ কর্মকে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। এছাড়াও দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় আদর্শ এবং প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের সুরক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুসমূহে রাজনৈতিক দলসমূহের ঐকমত্য অপরিহার্য। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। পাশাপাশি সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে সকল দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ক্ষমতায় যাওয়া বা কাউকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য বিশেষ কোনও বহিঃশক্তির আধিপত্যের কাছে নতি স্বীকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করাও জরুরি। এ ব্যাপারে দেশপ্রেমিক শক্তিকেই এগিয়ে আসতে হবে।

শেষ করার আগে স্যার ওয়াল্টার স্কটের একটি উদ্বৃতি দিতে চাই, তিনি বলেছেন, "স্বদেশ প্রেমিকের ধর্ম বীরের ধর্ম, ভীরুর ধর্ম নয়। হয়ত গৃহ লক্ষ্মীর আহ্বান তোমাকে মুহূর্তের জন্য বিমনা করবে। হয়ত পুরানো স্মৃতির মায়া তোমাকে আকর্ষণ করবে। কিন্তু জীবনের প্রতি পদে যারা ভয়ে ভয়ে ছোট ছোট বিধি নিষেধের গণ্ডিতে নিজেদের বেঁধে রেখে গুটি গুটি এগিয়ে যায় তাদের মত তোমাকে অচেনা অজানায় অখ্যাতির বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে না। আগামী দিনের পৃথিবী তোমাকে জানাবে সত্যিকারের শ্রদ্ধার্ঘ, হে বিদ্রোহী বীর, এগিয়ে চল।"

– (প্রবন্ধটি ৯ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে বিআইসি কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত)

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

1. Alasdair Maclntyre : Is Patriotism a Virtue, State University of New York Press, 1995
2. Charles Blattberg: From Pluralist to Patriotic Politics, Oxford Unversity Press, 2000.
3. Calhun: Is it Time to be Post National, Cambridge University Press, 2004.
4. George Orwelll: Notes on Nationalism, Secker and Warberg, 1953.
5. Paul Gomberg: Patriotism is Like Racism, Humanity Books, 2002.
6. Daniel Bar-Tal and Ervin Stand, Partriotism, Wadsworth Publishing 1999.
7. Weebies: Patriotism.
8. Milke Wasdin: Blind Patriotism.
9. Emma Goldman: What is Patriotism.
10. Samuel Johnson: Patriotism. Oxford University Press, 1948.
11. Al-Quran.
12. Oli Ahad: জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫।
13. Mahbubul Alam Chashi: In Quest of Swanirvar, Bangladesh Swanirvar Society.
14. Ministry of Foreign Affairs, Government of India, Bangladesh Documents.
15. S.K. Dasgupta Midnight Massacre in Dacca.
16. UPLB Press, Works of Dr. Rizal.

www.pathagar.com

সরকারের পতন আতঙ্ক ও বেপরোয়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

– ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শামছুল হক টুকু সম্প্রতি এক সমাবেশে বলেছেন যে, শুধু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর নির্ভর করে জামায়াত-শিবিরকে দমন করা যাবে না। তিনি এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য ছাত্রলীগ-যুবলীগ নেতা কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তার এই বক্তব্য সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন সারাদেশে জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযানের নামে হাজার হাজার নিরীহ ব্যক্তির উপর হামলা, মামলা ও নির্যাতনের স্টীম রোলার চলছে এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে তখন দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর ন্যায় দায়িত্বশীল পদে বসে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি দলীয় সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেয়ার সরকারি এই ঘোষণা দেশের ইতিহাসে এই প্রথম। অনেকে তার এই ঘোষণাকে দায়িত্বশীল পদের দায়িত্বহীন অপব্যবহার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সাম্প্রতিককালে শুধু জামায়াত-শিবির নয় দেশের ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য সরকার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে মনে হয়। কওমী মাদরাসাগুলোকে তারা জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে আখ্যায়িত করছেন এবং কোথাও জঙ্গিপনা বা সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলে তার জন্য ইসলামপন্থীদের দায়ী করছেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনগুলো যখন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে এবং হাতেনাতে ধরা পড়ছে তখনো তারা ইসলামপন্থী তথা জামায়াত শিবিরের উপর দোষ চাপাচ্ছেন,

www.pathagar.com

বলছেন যে জামায়াত ও শিবিরের লোকেরা তাদের দলে অনুপ্রবেশ করে এই কাজগুলো করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছেন যে, পাহাড়ে সমতলে সর্বত্র স্বাধীনতা বিরোধীরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, সরকার এখন মারাত্মক জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছে। জন্ডিস রোগী যেমন চারদিকে হলুদ দেখতে পায় সরকারও তেমনি তার চারদিকে জামায়াত-শিবির ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সরকারের এই অস্থির অবস্থার কারণ খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটিজিক স্টাডিজ এর সাবেক মহাপরিচালক জনাব এম. আবদুল হাফিজ আওয়ামী লীগ শাসনের গত এক বছরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একে শূন্যগর্ভ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি অতীতের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন যে, ক্ষমতার মদমত্ততা, নির্ভুল পদক্ষেপ ও শতভাগ সাফল্যের দাবির ন্যায় কিছু উপসর্গ আদতেই বালখিল্যতা যা সরকার বা ক্ষমতাসীনদের পতনের পূর্বলক্ষণ। আওয়ামী শাসনের এক বছরের মধ্যেই এই লক্ষণগুলো পরিষ্কার হয়ে দেখা দিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেছেন যে, আওয়ামী লীগের ইদানীং কালের সব সাফল্যই তুলনাবিহীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ, যদিও বা দলনেত্রীকে মাঝে মধ্যে কিছু হেরফের এনে তার রাজনীতির যুক্তি জাল বুনতে হয়। বেচারীকে দোষারোপই বা করা যায় কিভাবে! সামান্য গৃহবধূ থেকে বিশ্ব নেতার উত্থান কোন চাট্টিখানি কথা নয়। জাতির জনকের কন্যাকে তো সময়ে জাতির জনকের সমকক্ষ হতে হয়। লক্ষ্য করুন, কী অবলীলায় শুধু হিল্লী দিল্লী নয়, ওয়াশিংটন, জাতিসংঘ এবং কোপেনহেগেন মাত করেন তিনি। তবে সংশয় জন্মে শুধু এক জায়গায়ই, যখন তিনি সর্বত্রই সুপারলেটিভ ডিগ্রীতে কথা বলেন।

আওয়ামী সরকারের সূচনা হয়েছিল পিলখানা হত্যাযজ্ঞ ও বিশৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে যার যৌক্তিক সুরাহা আজো হয়নি। দু'টি তদন্তের কোনটিই এর পেছনের শক্তিকে চিহ্নিত করতে পারেনি। সেনা তদন্ত টীম এবং সরকারি তদন্ত কমিটি উভয়েই বলেছে যে, সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সহযোগিতার অভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের বেঁধে দেয়া টিওআর এর সীমাবদ্ধতার কারণে পিলখানা

www.pathagar.com

হত্যাযজ্ঞের মূল নায়কদের চিহ্নিত করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তারা এ কাজটি সম্পাদনের জন্য আরো তদন্তের সুপারিশ করেছেন।

আওয়ামী লীগ সরকার এ পথে আর অগ্রসর হয়নি, হয়ত অজানা কোনও ভয়ে। এই অবস্থায় একবছর পার করে দিয়ে সেদিনও প্রধানমন্ত্রী বললেন, তিনি পিলখানার রহস্য উঘাটন করে ছাড়বেন। কিন্তু এই শ্লথ গতিতে যদি সমস্যার জটই শুধু খুলতে হয় তবে ক্ষমতার মেয়াদও তো অনেক দীর্ঘ হতে হবে। দিন বদলের শ্লোগান দিয়ে দ্বীন বদলের যে ধ্বংসাত্মক কাজ আওয়ামী লীগ তা শেষ করার জন্যও সময়ের দরকার। অনেক প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রক্রিয়া শুধু অসমাপ্ত রয়ে গেছে তা নয় বরং শুরুই হয়নি। অনেক মামলার পুনর্বিচার ছাড়াও নতুন বিচারের প্রতিশ্রুতি তো আছেই।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাফিজের মতে, পূর্বে ইনিয়ে বিনিয়ে বললেও এবার শেখ হাসিনা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, আওয়ামী লীগের নবগঠিত সরকারকে উৎখাত করতে পিলখানা বিদ্রোহ ঘটানো হয়েছিল। এটা কি বছরাধিককাল ধরে পরিচালিত তদন্তের ফলাফল না প্রধানমন্ত্রীর নিছক ধারণা তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। অবস্থা যাই হোক এর ফলাফল জনসমক্ষে তুলে না ধরাটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। তিনি মনে করেন, যে কোন পতনোন্মুখ সরকারের জন্য অনেক ফন্দিফিকির আঁটতে হয়। এগুলো কোনও অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে একথাও ঠিক যে, এসব করে সরকারের পতনকে ঠেকানো যায় না। সমস্যা হচ্ছে যখন কোনও সরকার প্রচুর ভোটাধিক্যে ক্ষমতারোহণ করে তখন সরকারের সুস্থ চিন্তাধারা বিগড়ে যায়। আর নির্বাচনের ভূমিধস বিজয় যদি কারচুপির হয় তাহলে তো তারা পাগলই হয়ে যায়। দলটি তখন নিজেদের সম্পর্কে অনেক কথাই ভুলে যায়। ক্ষমতাসীন দলের জন্য এটাই কাল হয়। আওয়ামী লীগের অবস্থা এখন অনেকটাই এ পর্যায়ে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দেশ শাসনের এক বছর কাটিয়ে দেয়ার পর সর্বত্র তারা এখন ষড়যন্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাদের ব্যর্থতা মানেই প্রথমত অজ্ঞাত মহল, এখন জামায়াত শিবির ও বিএনপি-আইএসআই থেকে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

এই অভিযোগের সত্যতা কখনো যাচাই হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, বাকী চার বছরে দেশ শাসন বা সরকার পরিচালনায় আওয়ামী লীগের চেহারা আরো কতটুকু বিকৃত হবে।

www.pathagar.com

খ্যাতনামা নিরাপত্তা বিশ্লেষক জনাব হাফিজের মতে শাসকরা কদাচিত অভিযোগ করে। তারা বরং অভিযোগ খণ্ডন করে এবং সেগুলোর উত্তর দেয়। কিন্তু বছরাধিককাল আগে ক্ষমতায় এসেই আওয়ামী লীগ শুধু অভিযোগ করে যাচ্ছে। এই অভিযোগ ও ষড়যন্ত্রের ভূত দলটির কার্যক্রমকে এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, অনিবার্যভাবে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের পাল্লা হাল্কা থেকে হাল্কাতর হয়েছে। প্রতিশ্রুতি পূরণের কথা তারা ভুলে গেছে। জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে জননিরাপত্তার ক্রমাবনতির পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, লুটপাট, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-বাণিজ্য, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে সামন্তবাদী রাজনীতির প্রকৃত পরীক্ষা শুরু হবে যখন বাকী সময়টুকু দ্রুত ফুরিয়ে যেতে থাকবে। এতে প্রত্যাশীদের অসহিষ্ণুতা, অস্থিরতা ও প্রতিযোগিতা বেড়ে যেতে থাকবে, সরকার দ্রুত তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। এটাই নিয়ম। অপশাসন স্বৈরশাসনের অতীত অভিজ্ঞতাও তাই। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর বাকী সময়টার ধরন ও জটিলতা কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা জানা না থাকলেও আন্দাজ করা যায়।

অবশ্য সরকারের মধ্যে এখানে কোথাও হতাশা দেখা যায় না। সরকারের জিদ এখানে সুস্পষ্ট। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তিকে তারা নির্মূল করতে পারবেন। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল বিএনপি'র উপর কেয়ারটেকারের দু'বছর শাসনামলে যৌথবাহিনীর নিপীড়ন অত্যাচারের যে খড়গ নেমে এসেছিল তাতে দলটির মেরুদণ্ডই শুধু ভাঙ্গেনি তার সম্ভাবনাময় নেতৃবৃন্দের মেরুদণ্ডও এমনভাবে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে যে, দেশ বিদেশে ব্যয়বহুল চিকিৎসার পরও তারা সোজা হয়ে উঠে বসতে পারছে না, দলকে পুনর্গঠন ও চাঙ্গা করার জন্য চারণের মতো সারাদেশ চষে বেড়ানো তো দূরের কথা। বিএনপিকে তার কেন্দ্রীয় অফিস খুলতে দেয়া হয়নি। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উদ্যোগে এই দলটিকে দ্বিধাবিভক্তকরণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং এই পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন গড়ে উঠেনি। নির্বাচনোত্তরকালেও বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও তৃণমূল পর্যায়ে বিএনপির নেতা-কর্মীদের উপর যে অত্যাচার নিপীড়ন চলছে

www.pathagar.com

তার বিরুদ্ধে দলটি ফলপ্রসূ কোনও আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। আওয়ামী লীগ কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের মর্মান্তিক এই ঘটনাগুলো দেশ বিদেশে তেমন কোনও প্রচারণা পায়নি। বিএনপি নেতৃত্বে বিদেশী মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে এক্ষেত্রে যেমন কাজে লাগাতে পারছে না তেমনি ঢাকায় কর্মরত শতাধিক বিদেশী সংস্থা ও কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদেরও অকুস্থলে নিয়ে অবস্থার ভয়াবহতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা বিদেশী সংবাদ মাধ্যমসমূহের প্রতিনিধিদের ঘটনা প্রত্যক্ষ করার আমন্ত্রণ জানাতেও পারছে না বলে মনে হয়। এটা তাদের ব্যর্থতা না কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা বলা মুশকিল। তবে এর ফলে ক্ষমতাসীনরা নিজেদের নিরাপদ ও শক্তিশালী মনে করছে সন্দেহ নেই। তাদের এই অবস্থানকে আরো নিরাপদ করার জন্য তারা কেয়ারটেকার আমলে রুজু করা খুন, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির সকল মামলা থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ নিজ দলের সকল নেতাকর্মীকে অব্যাহতি দিলেও বিএনপিসহ বিরোধীদলসমূহের নেতাকর্মীদের অনুরূপ মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। উদ্দেশ্য একটাই নড়াচড়া করলেই হাতকড়া লাগানো। বিএনপি বা বিরোধীদল এই বৈষম্যমূলক বিষয়টিকেও মূলধন করে দেশের আদালত অথবা বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কোনও কেস তৈরি করতে পারেনি। এর দু'টি কারণ হতে পারে। বিরোধীদলীয় নেতাদের বিদেশ সফরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে সরকার তাদের খাঁচায় বন্দী করে ফেলেছেন। কারণে অকারণে ইমিগ্রেশনে তাদের বিদেশ যাত্রায় বাধা দেয়া হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে তাদের সভা সমাবেশ, মিটিং মিছিল করতে দেয়া হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যে, সারাদেশ এখন একটি বিশাল জেলখানায় রূপান্তরিত হয়েছে। সরকার ক্ষমতায় আসার পরপর সম্পূর্ণ অবৈধভাবে কয়েকজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করে একটি ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। পরবর্তীকালে চাকরিচ্যুতির আদেশ প্রত্যাহার করা হলেও অনেকেই মনে করছেন যে, মামলা মোকদ্দমার রায়ে বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের আগে যে স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হতো তা এখন খুব কমই হচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে যে, আদালতের রায় সরকারের প্রশাসনিক হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে যদিও বিষয়টি ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

www.pathagar.com

জামায়াত এবং শিবিরকে ক্ষমতাসীন দল এখন মূল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। রাজনীতির অঙ্গনে জামায়াতের ক্লিন ইমেজ-এর প্রধান কারণ হলেও পটভূমি ভিন্ন। চারদলীয় জোট সরকারে জামায়াতের দু'জন মন্ত্রীর সফল ও দুর্নীতিমুক্ত বিচরণ অনেকের নাড়িতে আঘাত করেছে। যারা বলতেন যে মোল্লারা দেশ চালাতে জানে না তারা হতাশ হয়েছেন। মন্ত্রী হলেই দুর্নীতি করতে হয়, ক্ষমতার অব্যবহার করতে হয় এ ধরনের ধারণা যারা পোষণ করতেন তারাও লজ্জা পেয়েছেন। সেনা সমর্থিত কেয়ারটেকার সরকারের আমলে সকল দলের সকল পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো বিপর্যস্ত হলেও জামায়াত অক্ষত ছিল। এতে বাম ও রামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ঐ সময়ে যৌথবাহিনীর তৎপরতাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলেও আখ্যায়িত করেছিল। ভারতীয় পত্র-পত্রিকা এবং সে দেশের সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করেছিল যে চলমান তৎপরতা অব্যাহত থাকলে সামনের নির্বাচনে জামায়াত নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে। এই আতঙ্ক তাদের বেপরোয়া করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত অর্থবিত্তের বিনিময়ে আঁতাতের নির্বাচনের মাধ্যমে এর দফা রফা হয়। ডিজি, ডিজিএফআই মেজর জেনারেল এটিএম আমীন ও সেনা প্রধান জেনারেল মইন উ আহমদ ২০০৮ সালে এই নির্বাচনের নাটক মঞ্চস্থ করেন। সেনা গোয়েন্দা সংস্থার তদারকীতে ব্যালট পেপারে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর অনুকুলে সীল মেরে বাক্স ভর্তি করে গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় আসনসমূহে প্রেরণ করা হয়। এই সংস্থারই নির্দেশনায় সারাদেশে শতাধিক আসনে পোলিং অফিসারদের সাথে যোগসাজশ করে ৩০ শতাংশ ভোট কাস্ট করে বাক্স ভর্তি করা হয়েছিল। এই কাজের সুবিধার জন্য আইডি কার্ড তৈরি হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনের কাজে তা ব্যবহৃত হয়নি। ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণীত হলেও প্রার্থীদের এজেন্টদের যে তালিকা সরবরাহ করা হয়েছিল তাতে ভোটারের ছবি ছিল না, নির্বাচন কমিশন এক্ষেত্রে চরম পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছিল এবং সারাদেশের ভোটকেন্দ্রগুলো আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। ক্ষমতাসীন দল তাদের এই দুর্বল পয়েন্টগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকেবহাল বিএনপিকে তারা ধ্বজভঙ্গ দল বলে মনে করে। আকার ও সংখ্যায় ছোট হলেও জামায়াতকে তারা তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি বলে মনে করে। এজন্যই জামায়াত-শিবির নির্মূলের জন্য তাদের এত আয়োজন। আর্মিকে তারা ভয় করত। প্রতিবেশী

www.pathagar.com

বাংলাদেশে তিনটি শক্তি তাদের স্বার্থ আদায়ের পথে প্রতিবন্ধক বিএনপি, জামায়াত এবং সেনাবাহিনী। এই তিনটি শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বছরের পর বছর তারা অপপ্রচার চালিয়েছে।

কেয়ারটেকারের শিখণ্ডিদের দিয়ে বিএনপির কোমড় ভেঙ্গেছে, এখন মেরুদণ্ড ভাঙ্গার কাজ করছে। পিলখানা হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে রৌমারী ও পাদুয়ার প্রতিশোধই শুধু নয় স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে তার কার্যকারিতাকেও চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার তাদের সহযোগী ও দোসর। তারা ২০২১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাকে নিষ্কল্টক করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করণ, যুদ্ধাপরাধের মামলা, জামায়াত-শিবির বিরোধী অভিযান পরিচালনা, এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে উপহাস করা, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম থেকে ইসলামের নির্বাসন এবং এমনকি মাদরাসার কারিকুলামেও ইসলামকে সঙ্কুচিত করার অপচেষ্টা তাদের এই পরিকল্পনারই অংশ।

পিলখানা হত্যাযজ্ঞে ৫৭ জন চৌকস সেনা কর্মকর্তাকে নির্মমভাবে খুন করা, তাদের পরিবার সদস্যদের ইজ্জত আবরু নষ্ট করা এবং লুটপাট ও বিদ্রোহের সাথে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের সরকার এক বছরের মধ্যে চিহ্নিত করতে পারেনি। সরকারের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং দলীয় নেতৃবৃন্দের সম্পৃক্তি নিয়েও এখানে নানা প্রশ্ন রয়েছে। তাদের বাঁচানোর লক্ষ্যে আলামত, সাক্ষ্য প্রমাণ ধ্বংস করার অংশ হিসেবে ৭১ জন বিডিআর জওয়ানকে হত্যাসহ ভিডিও রেকর্ড, মোবাইলে কথোপকথনের প্রামাণ্য ডকুমেন্ট, ইন্টারোগেশন সেলে প্রদত্ত জবানবন্দী প্রভৃতি নষ্ট করার অভিযোগও উঠছে এবং এই অভিযোগসমূহের সবগুলোই সরকারের বিরুদ্ধে। আপাতদৃষ্টিতে সরকার সফলভাবে এগুলো ধামাচাপা দিতে সক্ষম হয়েছেন। দেশে এর বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ হয়নি। সরকারের জন্য এটি একটি অনুপ্রেরণা এবং নতুন শক্তি ও উদ্দীপনার উৎস। এই শক্তি ও অনুপ্রেরণাই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন নির্যাতনে তাদের উৎসাহিত করছে বলে অনেকে মনে করেন। প্রতিরক্ষাবাহিনীর উপর আঘাত করে আত্মতুষ্টির যে স্বাদ কেউ কেউ পেয়েছেন তা থেকেও এটা হতে পারে। এই আত্মতুষ্টি আত্মঘাতী রূপ নিতেও বিলম্ব হবে না বলে আমার বিশ্বাস।

– দৈনিক সংগ্রাম, ০২ মার্চ ২০১০

www.pathagar.com

অথঃ ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগ সমাচার

– ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন

গ্রামগঞ্জে আগে আকাম কুকাম করলে অপরাধীদের পশুর সাথে তুলনা করা হতো। যেমন লোকটা বা লোকগুলো কি মানুষ না পশু। এর মধ্যে সাধারণ মানুষের একটা ঘৃণা ও বিদ্বেষ ফুটে উঠতো। সম্প্রতি এর পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হয়। অন্তত বিভিন্ন জেলা উপজেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ কথাটা সহজেই বুঝা যাচ্ছে। আমার এক সহকর্মী যিনি দিনাজপুরের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক তিনি জানিয়েছেন যে, তার জেলার বিভিন্ন স্থানে যখনই কাউকে মারাত্মক কোনও অপরাধ করতে দেখা যায়, তখনই লোকজন ভ্রু উল্টিয়ে জিজ্ঞাসা করে লোকটি কি মানুষ না আওয়ামী লীগ? তার দেয়া এই তথ্যটির সত্যতা যাচাই-এর জন্য আমি দেশের আরো বেশ কয়েকটি জেলার খোজ-খবর নিয়েছি। এবং সর্বত্র একই ধরনের সাড়া পেয়েছি। অর্থাৎ মর্মান্তিক হলেও একথা সত্য যে, দেশের ক্ষমতাসীন ও অন্যতম প্রাচীন এবং বৃহত্তম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বাংলা ব্যাকরণের দৃষ্টিতে বিশেষ্য থেকে বিশেষণ পদে পদোন্নতি পেয়ে গেছে। এর আগে কোনও দল নয়, ব্যক্তি হিসেবে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার সেনাপতি মীর জাফর আলী খান বাংলা বিহার উড়িষ্যার মাটি ও মানুষের সাথে গাদ্দারী করার জন্য এই পদোন্নতি পেয়েছিলেন- মীরজাফর নামটি এখন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর মানুষ এখন আওয়ামী লীগ শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেছে খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, দখলদারী, অস্ত্রবাজি প্রভৃতি অপরাধের অনুঘটক হিসেবে। অদৃষ্টের পরিহাস যে, এই বিশেষণটি অর্জনে দলটির মূল ধারার পাশাপাশি তার অঙ্গসংগঠনসমূহ বিশেষ করে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ, তরুণ লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, সৈনিক লীগ প্রভৃতি

www.pathagar.com

মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। তবে এক্ষেত্রে দেশব্যাপী সবচেয়ে বেশী দুর্নাম কুড়িয়েছে ছাত্রলীগ। তারা তাদের 'মৌলিক অপকর্ম' ছাড়াও দেশব্যাপী এখন ভাড়ায়ও খাটছে। অসাধ্য সাধন করতে চান? পুরাতন-নতুন শত্রুর সাথে সাথে পেরে উঠতে পারছেন না? বাড়ী দখল, জমি দখল, হাট-দখল, ঘাট দখল করবেন? কোনও ছেলে বা মেয়েকে তুলে আনতে হবে? ছাত্রলীগের সাথে যোগাযোগ করুন, চুক্তিতে আসুন, করে দেবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান? তাদের চাহিদা মত পয়সা দিন, ভর্তি পরীক্ষা লাগবে না। হোস্টেলে থাকবেন? এখানেও তাদের রেইট আছে, দিয়ে দিন, কোনও সমস্যা নেই। অনেক দিন আগে বিটিভি Spencer on Hire নামে একটি ধারাবাহিক ছবি দেখিয়েছিল। Spencer ভাল কাজের জন্য ভাড়া খাটতেন। ছাত্রলীগ যুবলীগ খাটে অপকর্মের জন্য, পার্থক্য শুধু এটুকু। তাদের কাছে কত অস্ত্র আছে এবং এর মধ্যে সীমান্ত পথে নিত্যপাচার হওয়া আর বিডিআর হত্যাযজ্ঞের সময় পিলখানার অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অস্ত্রের হিস্যা কত তা অনেকেই জানেন না। সরকারি এজেন্সিগুলো জানে কিনা সে ব্যাপারেও আমি নিঃসন্দেহ নই। ছাত্রলীগকে কেউ ফ্র্যাঙ্কিনস্টাইন আবার কেউ কেউ ঘরের শত্রু বিভীষণের সাথে তুলনা করে থাকেন। ফ্রাঙ্কিনস্টাইন ছিলেন ইংরেজ লেখিকা শেলীর প্রখ্যাত এক উপন্যাসের প্রধান নায়ক, একজন বিজ্ঞানী। তিনি মানুষের মত একটি জীব সৃষ্টি করে তারও নাম দিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কিনস্টাইন। নব সৃষ্ট এই ফ্রাঙ্কিনস্টাইন তার স্রষ্টা বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কিনস্টাইন থেকেও শক্তিশালী হয়ে মহাদানবের আকার ধারণ করে এবং তার স্রষ্টাকেই ধ্বংস করে দেয়। কারুর কারুর ধারণা, ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগেরই সৃষ্টি এবং এই সংগঠনটি তার সন্ত্রাস-অপকর্ম এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে এতই পারঙ্গম হয়ে উঠেছে যে, তার বিষাক্ত ছোবলে এখন স্বয়ং আওয়ামী লীগের অস্তিত্বই সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। আবার যেহেতু এর কাজকর্ম মূল সংগঠনের জন্য বদনাম কুড়াচ্ছে, তাদের জনপ্রিয়তাকে ধূলিসাৎ করছে এবং এর ফলে প্রতিপক্ষের অবস্থান শক্তিশালী হচ্ছে সেহেতু তারা ঘরের শত্রু তথা বিভীষণ না হয়ে যায় কোথায়? তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিভীষণ বলতে চাই না। হিন্দু পুরানের বিশ্র বা ঋষির বরে প্রাপ্ত তারই ঔরসজাত রসাতলের সুমালীর কন্যা কৈকসীর কনিষ্ঠ পুত্র বিভীষণ ধর্মাত্মা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তার অন্য ভাইয়েরা রাক্ষস ছিলেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হচ্ছে ছাত্রলীগ কি আসলেই আওয়ামী লীগের শত্রু? ঘরের শত্রু? অনেকেই মনে করেন এ ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তাদের প্রশ্ন, আওয়ামী লীগ কি আওয়ামী লীগের শত্রু নয়? ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলিতে স্পীকার শাহেদ আলীকে যারা হত্যা করেছিলেন তারা যেমন আওয়ামী লীগার ছিলেন তেমনি নিহত শাহেদ আলীও আওয়ামী লীগার ছিলেন। এই হত্যাযজ্ঞকে অসিলা করেই তৎকালীন পাকিস্তানে মার্শাল ল' জারি করা হয়েছিল। আবার ১৯৭২ সাল থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে লুটপাট, সন্ত্রাস, নির্যাতন, গুপ্ত হত্যা ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নির্মূলের যে অভিযান চলেছিল এবং যার ফলে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল তাও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের কারণেই। পঁচাত্তর সালে শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করেছিলেন তাদের কেউই মুসলিম লীগ, জামায়াত, পিডিপি, নেজামে ইসলাম বা অন্য কোনও ধর্মীয় দলের নেতা-কর্মী ছিলেন না; খন্দকার মোশতাক থেকে শুরু করে সকলেই আওয়ামী লীগারই ছিলেন। নতুন মন্ত্রিসভা তারাই গঠন করেছিলেন এবং যে সংসদ এই হত্যাকাণ্ডকে ইনডেমনিটি দিয়েছিল সেই সংসদের সদস্যরাও আওয়ামী লীগারই ছিলেন। বর্তমানেও একই অবস্থা বিরাজ করছে। ছাত্রলীগ সন্ত্রাস করছে, অস্ত্রের মহড়া দিচ্ছে, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র, যুব ও শ্রমিক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা করছে, চাঁদাবাজি, টেন্ডাবাজি করছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিচ্ছে, ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিয়ে বাণিজ্য করছে, সীট নিয়ে বাণিজ্য করছে, অসহায় মেয়েদের ধর্ষণ নির্যাতন ও শ্লীলতাহানি করছে। প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের হল থেকে বের করে দিচ্ছে তাদের কক্ষ লুট করছে, আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। যারা প্রতিবাদ করছে তাদের মেরে হাত-পা ভেঙ্গে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে। বালিকা বিদ্যালয় ও মহিলা কলেজসমূহে ছাত্রলীগ নেত্রীরা নিজেরা যেমন পয়সার লোভে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ছে তেমনি সংগঠন ও সংগঠন বহির্ভূত অন্যান্য মেয়েদেরও সতীত্বকে পদদলিত করে অনৈতিক কাজ করতে বাধ্য করছে, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা, ব্যবসায়ী শিল্পপতি, এমনকি বিদেশীদেরও মনোরঞ্জনে বাধ্য করছে। এগুলো কারুর মনগড়া কথা নয়। পত্রপত্রিকায় হরহামেশা প্রকাশিত রিপোর্টের সারাংশ মাত্র। এতে আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড বা সরকারের নীতি-নির্ধারক অথবা তথাকথিত সুশীল

www.pathagar.com

সমাজের মধ্যে আপত্তি বা উদ্বেগের কোনও লক্ষণ দেশের মানুষ দেখেনি। তারা মাদকাসক্ত হচ্ছে, মাদকব্যবসা করছে, তাতেও এরা আপত্তির কিছু দেখেন না। তাদের উৎপাত ও নির্যাতনের দেশব্যাপী অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের শিক্ষাজীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এতেও তারা নাখোশ বলে মনে হয় না। কিন্তু ভাগ-বাটোয়ারা, ভোগ দখল আধিপত্য আর আনুগত্য নিয়ে যখন নিজেরা নিজেরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, খুন-জখম-অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ঘটনা ঘটে তখন বিপত্তি দেখা দেয়। গেল গেল বলে হৈ চৈ পড়ে যায়। একজন নেতা ঘটা করে নেতৃত্বের যোগ্যতা যাচাই-এর অংশ হিসেবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক-ফটোগ্রাফারদের ডেকে পাবনাতে রক্ত আর পেশাব পরীক্ষার মহড়াই করে ফেললেন। এটা দেখে আমার এক বন্ধুতো বলেই ফেললেন যে, অনুকূল ঠাকুর তার আশ্রম ও মানসিক হাসপাতাল স্থাপনের জন্য জেলাটিকে নির্বাচন করে ভুল করেনি। কেননা যে স্থানে এ ধরনের লোক আছে সে স্থান এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্তই বটে। আমি একথা বলতে চাই না যে, আওয়ামী লীগের শিরা-উপশিরায় যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে সেই একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ছাত্রলীগ যুবলীগের শিরা উপশিরায়ও। কাজেই রক্ত পরীক্ষা শুধু ছাত্রলীগের করলেই হবে না আওয়ামী লীগ যুবলীগ থেকে শুরু করে সকলেরই করতে হবে। আমার যদি লজ্জা না থাকতো তাহলে আমি নিশ্চয়ই বলতাম যে, যে সংগঠনের কর্মীদের রক্ত আর প্রস্রাব পরীক্ষায় পাস করে নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, সে সংগঠন তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত অধঃপতনের কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে তা ভেবে দেখা দরকার। এরা কি সত্যিকার অর্থে দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষা ও প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে? মরহুম মওলানা ভাসানী একজন নেতাকে তার আপার চেম্বার খালি বলে গালি দিতেন। এখন ঐ গালিটি দেয়ার জন্য তিনি জীবিত না থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে দল বিশেষের শতশত নেতার আপার চেম্বারই খালি হয়ে পড়েছে। নীতি-নৈতিকতা যদি না থাকে তাহলে ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে। আবার এই ক্ষমতার পরিধি যদি ব্যাপক হয় তাহলে এই দুর্নীতি সর্বগ্রাসী হয়ে পড়ে। আঁতাতের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভাবিত পূর্ব ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য নিয়ে যে ব্যাপক ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে তাতে তাদের পায়ে আর মাটির স্পর্শ নেই বলেই মনে হয়। এ প্রেক্ষিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, দখলদারিত্ব ও দেশের সম্পদ

www.pathagar.com

লুণ্ঠনের যে ভূত তাদের মাথায় চেপে বসেছে তা তাদের বেপরোয়াই করে তুলেছে। এই বেপরোয়া আচরণ তাই তাদের সকল অঙ্গ সংগঠন ও পৃষ্ঠপোষকতাধন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও বেপরোয়া করে তুলেছে। ছাত্রলীগ এর ব্যতিক্রম নয়। এই অপরাধ তাদের একার নয়, তাদের স্রষ্টারও।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দিন থেকেই ছাত্রলীগ তার দুষ্কর্মের জন্য খবরের শিরোনাম হয়ে আসছে। তাদের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অস্ত্রবাজি, দখলবাজি প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে অবিলম্বে এই সংগঠনটির নেতাকর্মীদের বিপথগামিতা রোধ করার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করে দৈনিক প্রথম আলোসহ কয়েকটি পত্রিকা বিশেষ রিপোর্ট ও সম্পাদকীয়ও প্রকাশ করেছে। তাদের এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতৃত্ব থেকে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন। তার এই পদত্যাগের আগেই অনেকেই জানতেন না যে তিনি ছাত্রলীগেরও নেত্রী। এই পদত্যাগ কি কোনো কাজে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ এক ভাষাতেই বললেন ছাত্রলীগের সন্ত্রাস আসলে তাদের সন্ত্রাস নয়, এই দলের নেতৃত্বে অনুপ্রবেশ করে ছাত্রদল ও শিবিরের লোকেরাই এই সন্ত্রাস করছে। অদ্ভুত যুক্তি। তা হলে পদত্যাগ করলেন কেন? মানুষকে প্রতারিত করার জন্য? একজন প্রধানমন্ত্রী প্রতারণা করবেন, আমি বিশ্বাস করতে পারি না। ছাত্রলীগে ছাত্রদল শিবির খুঁজে বের করার জন্য একাধিকবার একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে কমিটিও করলেন, তার ফলাফল কি? এভাবেই চলতে থাকলো ছাত্রলীগের সব অপকর্মের দায়ভার আওয়ামী লীগ ও সরকার ছাত্রদল ও শিবিরের উপর চাপিয়ে দেয়া অব্যাহত রাখলেন। নির্ভরযোগ্য কিছু সূত্রকে আমি বলতে শুনেছি যে শেখ হাসিনা প্রথম ছাত্রলীগকে তিন মাসের সময় দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যা করার তিন মাসের মধ্যে করে নাও এর পর আর সময় পাবে না। এই তিন মাস সম্প্রসারিত হতে হতে এখন ষোল মাস পার হচ্ছে ছাত্রলীগের আধিপত্য সন্ত্রাস ও অবৈধ রুজি কামাই আর থামেনি। শোনা যায় যে যারা থামাবেন তারাও এর ভাগ পান। ভাগ পেয়ে হাইকমান্ড যদি সন্তুষ্ট থাকে তা হলে এই দানবদের ধ্বংসযজ্ঞে আর বাধা কোথায়? আবার আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে যখনই এদের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড দেশব্যাপী উত্তেজনা ছড়ায় তখনি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ সরব হয়ে

www.pathagar.com

উঠেন তারা ছাত্রলীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেন। তাদের অত্যাচারে জনমত যখন অতীষ্ঠ হয়ে উঠে তখনি তাদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা দেয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে আজ পর্যন্ত ছাত্রলীগের খুনি সন্ত্রাসী ও ধর্ষক নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে তারা বহিষ্কার ছাড়া শাস্তিমূলক আর কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আবার বহিষ্কারও কার্যকর হয়নি। পত্র পত্রিকাতেই রিপোর্ট বেরিয়েছে যে বহিষ্কৃত এসব নেতারাই সংগঠন পরিচালনা করছে। তা হলে দেশবাসীর সাথে এই মস্কারাটা কেন করা হলো। আবার সীমা অতিরিক্ত অপকর্মে যখন দলের ইমেজকে ধ্বংস করার উপক্রম হয় তখন দেশবাসীর দৃষ্টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য দলটি নতুন অপকর্ম করে তার দায় অন্য দলের উপর চাপিয়ে দিয়ে গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাকে তার পেছনে লাগিয়ে দেয়। যেমন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আবু বকর হত্যাকাণ্ডের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে মেরে তার দায় শিবিরের উপর চাপিয়ে দিয়ে দেশব্যাপী চিরুনী অভিযানের নামে জামায়াত শিবিরের উপর নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানোর ঘটনা। এই ঘটনার জের এখনো চলছে। সারাদেশের হাজার হাজার শিবিরকর্মী নির্যাতিত হচ্ছে, বেশ কয়েকজনকে তারা ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছে এবং নিরপরাধ এসব ছেলেদের শিক্ষা দীক্ষা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

বরিশাল পলিটেকনিকে সম্প্রতি ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজ দু'গ্রুপের নৃশংস যুদ্ধ ও ধ্বংসযজ্ঞ নতুন করে পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে। এর ফলে ক্ষমতাসীন দলের ইমেজ নিয়ে অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তারা বলছেন ক্ষমতাসীন দলকে বাঁচানোর জন্য ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এর আগে দেশের পাঁচজন বুদ্ধিজীবী ছাত্রলীগের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। তাদের এই আহ্বান আমার কাছে ভূতের মুখে রাম নামের মতই মনে হয়েছে। ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিতেরও প্রশ্ন উঠেছে। আমার মতে ছাত্র হিসেবে ছাত্রলীগের কার্যক্রম তো অনেক আগেই স্থগিত হয়ে আছে, নতুন করে স্থগিত করার কি কিছু আছে। তারা তো এখন ছাত্র নয় ছাত্রের নামে কলংক সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, টেন্ডারবাজ, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও নারী নির্যাতনের ঘটক অনুঘটক দুর্দান্ত

www.pathagar.com

ক্রিমিনাল। এই ক্রিমিনালদের দেশের প্রচলিত ক্রিমিনাল ল'র অধীনেই যদি বিচার করতে না পারা যায় তাহলে সম্পর্কোচ্ছেদ বা কার্যক্রম স্থগিত করে কোনো লাভ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

ছাত্রলীগ শিক্ষাঙ্গনে এখন একটি আতংকের নাম। অধ্যয়নের সাথে তাদের সম্পর্ক এখন নেই। তারা তাদের কৃত অপরাধের শাস্তি পায়নি। খুন করেও ছাড়া পেয়েছে এবং পাচ্ছে। অনুপ্রাণিত হচ্ছে। দৈনিক সমকাল ৬ মে' "ওরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে" শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ছাত্রলীগের অপরাধের এক নিটোল চিত্র তুলে ধরেছে। এই প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক ছাত্রলীগের অপরাধ সিন্ডিকেটের একটি বিশদ বর্ণনা আছে। এই বর্ণনায় এই ছাত্র সংগঠনটির অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি যৌন উত্তেজক ইয়াবা বাণিজ্য ও ইয়াবাশক্তির চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। অভিভাবকরা ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া শেখার জন্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায়। লেখাপড়া শিখে এরাই দেশ চালায়। ছাত্রলীগের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে এসে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আসক্তি ও বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ছে তাতে চরিত্র বলতে যা বুঝায় তার সব কিছুই তারা হারিয়ে ফেলছে। আওয়ামী লীগ হাই কমান্ড তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের এই অবস্থা কি জানেন না? নাকি জেনেও তার প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। ইডেন কলেজে তাঁদের দলীয় নেত্রীদেরই একাংশ অভিযোগ তুলেছিলেন যে নেতাদের মনোরঞ্জনে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক অভিযোগ ছিল। শুধু ইডেন কলেজ নয়, বদরুন্নেছাসহ অন্যান্য কলেজ থেকেও এই অভিযোগ উঠেছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী, নারীর ইজ্জত নষ্ট করার যে অভিযোগটি তার দলের বিরুদ্ধে উঠলো আমার মতো অনেকেরই ধারণা ছিল তিনি তাৎক্ষণিভাবে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করে এদেশের নারী সমাজকে এই বেইজ্জতি থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

কেউ কেউ বলছেন যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে এই দলটি ও তার অঙ্গ সংগঠনের পুরুষ সদস্যদের জওয়ানী বেড়ে যায় (যেমন ১৯৭১-৭৫ ও ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে তাদের অপকর্মের রেকর্ড) তখন অবশ্য ছাত্রলীগের মহিলা শাখার বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে যে

www.pathagar.com

তারাও অনৈতিক জওয়ানীর সাথে জড়িয়ে পড়ছেন। এর জন্য আওয়ামী নেতৃত্বকে দায়ী না করে কি উপায় আছে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় শুধু, সমাজ থেকেই তারা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা তুলে দিতে তৎপর হয়ে পড়েছেন। দেশব্যাপী কুরআন হাদিস চর্চার মাহফিল তারা সহ্য করতে পারেন না, বন্ধ করে দিয়েছেন। এমন এক ব্যক্তিকে শিক্ষামন্ত্রী বানিয়েছেন যিনি ধর্মকে আফিমতুল্য বলে বিশ্বাস করেন। ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধের চেষ্টা তো আছেই। এই অবস্থায় ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড স্থগিত করে কোন লাভ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এজন্য খোদ আওয়ামী লীগের চরিত্র সংশোধন এবং প্রতিপক্ষ নির্যাতন বন্ধ করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য বলে আমি মনে করি।

– দৈনিক সংগ্রাম, ১১ মে ২০১০

www.pathagar.com

দুঃশাসন সরকার পতন অনিবার্য করে তোলে

– ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন

যারা মহাভারত পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ধৃতরাষ্ট্রের তৃতীয় পুত্রের নাম ছিল দুঃশাসন। দুঃশাসন ছিলেন চিরদিন দুর্যোধনের সহচর। আর দুর্যোধন ছিলেন কূটবুদ্ধি, দুষ্ট ও কুরুকুলের কলঙ্কিত এক রাজা। তার আরও পরিচয় ছিল- তিনি গর্বিত, মন্দমতি, ধর্ম থেকে চ্যুত, গুণীজনকে অসম্মানকারী অথচ নিজে সম্মানকামী, প্রাজ্ঞমানি, মিত্রদোহী, ক্ষুদ্রচেতা, ক্রোধী, মূঢ়, দুরাত্মা, একগুঁয়ে, কামুক, সন্দেহপ্রবণ, অকৃতজ্ঞ, মিথ্যাপ্রিয়, মোহাবিষ্ট, অজিতেন্দ্রিয় স্বেচ্ছাচারী এবং সকল কাজেই অব্যবস্থিত চিত্ত। জতুগৃহ দাহের ষড়যন্ত্র দিয়ে তার জীবন শুরু হয়েছিল। ভারতসম্রাজ্ঞী কৃষ্ণাকে অন্তঃপুর থেকে চুল ধরে প্রবীণদের মধ্যে টেনে আনতে তার বিন্দুমাত্র লজ্জা হয়নি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে পশুশক্তির বলে সভায় এনে কর্নের আদেশে তিনি তাকে বিবস্ত্র করতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী কৃষ্ণ প্রিয়, কৃষ্ণসখী, ভক্তির জোরে তার মান রক্ষা করেছিলেন।

দুর্যোধনের সহযোগিতায় সারা ভারতবর্ষে তিনি যে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, জুলুম, নিপীড়ন, হত্যা, গুম, লুটপাট, ধর্ষণ ও নির্যাতনের ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন সভ্যতার ইতিহাসে তার কোনও নজির নেই। হিন্দু পুরানে বিশ্বাসীদের ধারণা অনুযায়ী তারই নামানুসারে দুনিয়াব্যাপী জালেম শাসকদের সকল অপকর্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'দুঃশাসন' পরিচয় নিয়ে আজো টিকে আছে। তবে তার এই টিকে থাকাটার মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই। বারবার সে পরাজিত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে সে পালিয়ে

www.pathagar.com

বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। যুদ্ধক্ষেত্রে সপ্তদশ দিবসে ভীম গদার আঘাতে দুঃশাসনকে প্রহার করলে তিনি চল্লিশ হাত দূরে নিক্ষিপ্ত হন। দ্রোন তাকে শান্তি স্থাপন ও ধর্মরাজকে রাজ্য প্রত্যার্পণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃশাসন সাড়া দেননি। শেষ পর্যন্ত ভীম তীক্ষ্ণ অসি দিয়ে দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্ত পান করেছিলেন। পরে তার শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। (দ্রোন পর্ব ১০৬/১-২৩, কর্ণ পর্ব ৬১/৪৩-৭৪)

মহাভারতের দুঃশাসনের গল্পটি আমার মনে পড়লো আমাদের ক্ষমতাসীন ভারতমুখী সরকারের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড এবং প্রবণতা দেখে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলার আগে ১৯৭১ সালের একটা ঘটনার কথা বলি। একটি জাতীয় দৈনিকে কাজ করার পাশাপাশি ঐ সময় ঢাকার কায়েদে আজম কলেজে (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) আমি শিক্ষকতা করতাম। অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব আবু মোহাম্মদ আবদুর রউফ ফাতেমী। অত্যন্ত জাঁদরেল শিক্ষাবিদ। মার্চ মাসের ১৭ তারিখ বিকালে আমরা কয়েকজন শিক্ষক অধ্যক্ষের কক্ষে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। অধ্যাপক লতিফুর রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ হোসেন, অধ্যাপক আবুল হোসেন, মহিউদ্দিন, সিরাজুদ্দৌলা, আবদুল লতিফ, আবদুল জব্বার, এমআর খান, বিসি পান্ডে, ইদ্রিস আহমেদ প্রমুখ ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তৎকালীন ডাকসুর দু'জন ছাত্রনেতা আসলেন এবং বিনা ভূমিকাতেই বললেন যে, আমরা কলেজের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা শিক্ষকরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। অধ্যক্ষ ফাতেমী ছিলেন নির্ভীক ব্যক্তি, যুক্তিবাদী। তিনি তাদের কথা শুনলেন এবং প্রস্তাবটি জানতে চাইলেন। তারা কায়েদে আজমের পরীবর্তে নজরুলের নামে কলেজটির নামকরণ করার প্রস্তাব দিলেন। অধ্যক্ষ ফাতেমী সবাইকে বিস্মিত করে তাৎক্ষণিকভাবে তা নাকচ করে দিলেন। বললেন, আমি তোমাদের সাথে একমত নই। কেননা আমি তোমাদের মধ্যে যে প্রবণতা দেখছি তাতে এটা পরিষ্কার যে নজরুলের নামটি আবার পরিবর্তন করে তোমরা কলেজের নাম Tagore college করবে। কাজেই তোমরা যদি এক্ষুণি Tagore এর নামে কলেজের নামকরণ করতে চাও তাহলে আমি এক্ষুণি তা সাপোর্ট করব। ছাত্রনেতারা সেদিন খালি হাতে ফিরে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর অবশ্য কলেজটির

www.pathagar.com

নাম নজরুলের নামে না হয়ে সোহরাওয়ার্দীর নামে হয়েছিল। আজকে যখন আমাদের সকল মুসলিম ঐতিহ্যকে ধুয়ে মুছে ভারতের হিন্দু ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার সামষ্টিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকতে দেখি এবং এমনকি ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক বই পুস্তক ও কিতাবাদিকে 'জঙ্গি ও জিহাদী পুস্তক' আখ্যায়িত করা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের আস্ফালন শুনি তখন অধ্যক্ষ ফাতেমী যে প্রবণতাটির আশংকা করেছিলেন তার তাৎপর্য বুঝতে আর অসুবিধা হয় না।

আমি দুঃশাসনের কথা বলছিলাম। আমি গত ১১ থেকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত পেশাগত কাজে ঢাকার বাইরে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা সফরে ছিলাম। সফররত জেলাগুলোর মধ্যে ছিল বগুড়া, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ। সফরকালে আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি এবং সর্বস্তরের মানুষের সাথে মত বিনিময় এবং দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ছাড়াও সামগ্রিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেছি। এতে আমার মনে হয়েছে যে, মহাজোট সরকার সারাদেশে এখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে দুঃশাসন জগদ্দল পাথরের মতো মানুষের বুকে চেপে বসেছে। ক্ষমতাসীনদের একটা অংশ এই দুঃশাসনকে ব্যবহার করেই তাদের স্বার্থসিদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই, যে স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য গোটা ষাটের দশক, বিশেষ করে ১৯৭১ সালে আমরা সংগ্রাম করেছি, লাখ লাখ লোক জানমালের ত্যাগ স্বীকার করেছে নির্যাতনের শিকার হয়েছে, সেই স্বাধীনতা, অধিকার ও মূল্যবোধ সকলের চোখের সামনেই ভূলুণ্ঠিত ও পদদলিত হচ্ছে। সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কার্যত সর্বত্র অবরুদ্ধ। তারা এমনকি নিজ নিজ অফিস কক্ষ কিংবা অফিস অঙ্গনেও সভা সমাবেশ করতে পারছেন না। তারা গ্রেফতার ও পুলিশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। সবগুলো জেলাতেই অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতা পৈশাচিক ও নারকীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আগে দেখা যেতো যে, অপরাধীরা অপরাধ করে প্রাণভয়ে বা ধরা পড়ার আশংকায় পালিয়ে যাচ্ছে, এখন তারা পালায় না, বরং বুক ফুলিয়ে দুঃসাহসের সাথে মরিয়া

www.pathagar.com

হয়ে নিরপরাধদের উপর চড়াও হচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এলাকাবাসীর কাছ থেকে এক ও অভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে এবং তা হচ্ছে তাদের জন্য গ্যারান্টিকৃত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা। পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের নিরাপত্তা কবচ হিসেবে কাজ করছে। প্রায় প্রতিদিনই ক্ষমতাসীন দল ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং লীগ নামধারী অন্যান্য সংগঠনের লোকেরা প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন বিশেষ করে জামায়াত-শিবির এবং কোথাও কোথাও বিএনপি'র নেতাকর্মীদের উপর হামলা করছে, তাদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মেসে আক্রমণ চালাচ্ছে এবং পুলিশের সামনেই তারা এসব অপরাধ করছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তারা সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনের কাজে লিপ্ত হচ্ছে। পুলিশ এক্ষেত্রে শুধু নির্লিপ্তের ভূমিকাই পালন করছে না বরং উল্টো নির্যাতিতদের গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে আরো নির্যাতন করছে। আগে দেখা যেতো মন্ত্রী-ভিআইপিরা পুলিশী এসকট পাচ্ছে এখন ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজ ক্রিমিলালরাও অলিখিতভাবে এই এসকট ব্যবহার করছে। ফলে দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস যে পরিবেশের সৃষ্টি করেছে তাতে সর্বত্র কবরের নিস্তব্ধতা নেমে আসছে বলে মনে হয়। মহাজোটের 'দুঃশাসনে' অপরাধের সংজ্ঞাও পাল্টে যাচ্ছে। দাগী অপরাধীরা হয়ে যাচ্ছে জাতীয় বীর। পক্ষান্তরে নির-পরাধ ধর্মভীরু, দেশপ্রেমিক আধিপত্যবাদ-বিরোধী পান্ডিত্যসম্পন্ন সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজনীতিক ও ছাত্র নেতাকর্মীরা হয়ে যাচ্ছেন জঙ্গি, সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রদ্রোহী। এই অবস্থায় সর্বত্র মানুষ স্তম্ভিত ও বিব্রত।

বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয়ভাগে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এই অধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ২৭)। সরকার এবং সরকারি দল প্রকাশ্যে এখন মানুষকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদে সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা, ৩১ নং অনুচ্ছেদে আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার, ৩২ নং অনুচ্ছেদে জীবন ও ব্যক্তি

www.pathagar.com

স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ, ৩৩ নং অনুচ্ছেদে গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, ৩৬ নং অনুচ্ছেদে চলাফেরার স্বাধীনতা, ৩৭ নং অনুচ্ছেদে সমাবেশের স্বাধীনতা, ৩৯ নং অনুচ্ছেদে চিন্তা বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা এবং ৪১ নং অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। সরকার তাদের প্রণীত যে সংজ্ঞার ভিত্তিতে দেশ ও দেশবাসীকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দিয়েছেন তাতে শুধু বিভেদ নয় নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যারা ভারতের পক্ষে কথা বলে, নব্বইভাগ গণমানুষের ধর্মাদর্শ ইসলামের প্রতি কথা ও কাজে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধকে অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করে না এবং আধিপত্যবাদের ক্রীড়ণক তারা ক্ষমাতসীনদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তি। অন্যদিকে দেশের সকল হক্কানী আলেম উলামা, শিরক, বিদআত বিরোধী ইসলামী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাকর্মী, মাদরাসা শিক্ষক ছাত্র জনতা, টুপি দাঁড়িধারী মুসল্লি, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মী, আধিপত্যবাদ বিরোধী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সকল দলের নেতাকর্মী সমর্থক তাদের দৃষ্টিতে জঙ্গি, সন্ত্রাসী, রাষ্ট্রদ্রোহী ও স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি। পক্ষ-বিপক্ষের এই বিভক্তির ভিত্তিতেই সর্বত্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, দুঃশাসন ও নৈরাজ্যের রাজত্ব কায়েম হয়েছে বলে মনে হয়। সরকারের পেটুয়াবাহিনী ও পুলিশ যারা আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষ, তাদের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদী তাদের সকলকেই রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে গণ্য করছে এবং শুধু রাজনৈতিক অঙ্গন নয় দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে গুম ও রিমান্ড নির্যাতনেরও আশ্রয় নিচ্ছে। প্রতিবেশী একটি দেশের গোয়েন্দাসংস্থা 'র' এবং ইহুদী সংস্থা মোসাদ এ কাজে তাদের সহযোগিতা করার অভিযোগও উঠেছে। ভারতকে বাংলাদেশের বন্দর, রেল সড়ক ও নৌ ট্রানজিট-করিডোর এবং আমাদের মূল্যবান গ্যাস কয়লা সম্পদ ব্যবহারের অনুমতিদানে সরকারের শর্তহীন তৎপরতা ও তাঁড়াহুড়ো এবং প্রতিবাদী কণ্ঠকে নিস্তব্ধ করার অপরিহার্য গরজ সর্বত্র মানুষের মধ্যে এই অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। তারা এই অবস্থাকে ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদী মুশরিকদের ঐক্যবদ্ধ ক্র্যাকডাউন বলে মনে করছেন। তাদের স্তম্ভিত ও হতবাক অবস্থা আমাকে ঘূর্নিঝড়-পূর্ব নিম্নচাপজনিত স্তব্ধ আবহাওয়ার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধীরা এখন স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাবোধ নিয়ে সর্বত্র বিচরণ করছে, আইনানুগ দেশপ্রেমিকরা এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জেলা ও বিভাগীয় শহরগুলোতে বেশকিছু মসজিদ আছে যেখানে শুধু জু'মার নামায নয়, ওয়াক্তিয়া নামাযেও পুলিশ প্রহরা বসে, যাতে সরকারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুসল্লিরা বিক্ষোভ মিছিল বের করতে না পারে। মুসলমানদের দেশে এখন মুসলমানরা নিরাপদে মসজিদে যেতে পারেন না, সেখান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। পবিত্র শ'বে মেরাজের আলোচনা সভাতেও তারা হামলা করছে, বক্তা, শ্রোতা-দর্শকদের গ্রেফতার করছে। জামায়াত ও শিবিরের ন্যায় আইনানুগ বৈধ দলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এমন সব অভিযোগ আনছে যা প্রত্যক্ষদর্শী দেশবাসীর ৪০ বছরের অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিশীল নয়। বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী, নবাবগঞ্জ সর্বত্রই সাধারণ মানুষকে আমি জামায়াত নেতাদের গ্রেফতার-নির্যাতনে সরকারি বাধা সত্ত্বেও প্রতিবাদমুখর হতে দেখেছি। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, সরকার যাদের দেশের শত্রু বলছেন তারা তো গত ৪০ বছর ধরে দেশকে দিয়েছেন, দেশ থেকে নেবার চেষ্টা করেননি। এমনকি পাঁচ বছর ধরে মন্ত্রিত্বকালেও তারা ব্যক্তি, পারিবারিক ও দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের কোনও চেষ্টা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তও তারা স্থাপন করেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াত নেতাদের স্থাপিত হাজার হাজার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেবা প্রতিষ্ঠান তাদের দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত। তাদের তৈরি মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এতিমখানা, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের বিশাল নেটওয়ার্ক তারা দেশের মানুষের জন্য তৈরি করেছেন, পারিবারিক আয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য নয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ৯৯ ভাগই ট্রাস্টের মালিকানাধীন, ব্যক্তি মালিকানায় নয়। এগুলোর আয় জনকল্যাণেই ব্যয়িত হয়। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী, অসহায় এতিম ও সাধারণ মানুষ ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে হাজার হাজার শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পরিবার লাভবান হচ্ছেন। জামায়াত নেতাদের স্থাপিত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল centre of excellence হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছে। সফরকালে অনেকেই আমার কাছে প্রশ্ন করেছেন, এই যাদের অবস্থা তারা যদি দেশদ্রোহী ও অপরাধী হন তাহলে কি চাঁদাবাজ,

www.pathagar.com

দুর্নীতি পরায়ণ, মুনাফাখোর ও সন্ত্রাস লালনকারীরাই কি দেশপ্রেমিক? যদি তাই হয় তাহলে দেশ ভবিষ্যতে অপরাধীদের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হবে, ভদ্রলোকের বাসস্থান নয়।

এই সফরে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোকে আমার কাছে একটা বৃহৎ কারাগারের মতো মনে হয়েছে। এই কারাবাসীরা যেকোন সময় কারার লৌহ কপাট ভেঙ্গে দিতে পারে বলেও আমার প্রতীতি জন্মেছে। গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে, কর্মসংস্থান নেই, যা আছে দলীয়করণের ফলে ক্ষমতাসীনদের হাতে তা কুক্ষিগত। সরকারি সংস্থা ও এজেন্সিসমূহের সেবা কার্যক্রমও দুর্নীতি ও দলীয়করণের কারণে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। চাঁদাবাজি সহ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। এই অবস্থায় গণবিস্ফোরণের অসহনীয় একটি পরিবেশের দিকে দেশ অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা নাই, আছে দলাদলি ও ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ-যুবলীগের চাঁদাবাজি, ভর্তিবাণিজ্য, টেন্ডারবাজি ও প্রতিপক্ষের উপর হামলা মামলার অসহনীয় দৃষ্টান্ত। কর্তৃপক্ষ তাদের হাতে জিম্মি। একমাত্র শিবির করার কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ছাত্রকে ক্লাস করতে দেয়া হচ্ছে না। তারা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছেন না। এতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কয়েক হাজার ছাত্রের বিনা ডিগ্রীতে ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে। দেশবাসী কি এদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে পারেন না?

আমি মহাভারতের যুবরাজ ও দুঃশাসনের গল্প দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। দুঃশাসনের শুরু ছিল ক্ষমতার অপব্যবহার, দাম্ভিকতা ও হিংসা বিদ্বেষ দিয়ে, পরিণতি ছিল মর্মান্তিক। আমাদের সরকার দুঃশাসনের প্রেতাত্মায় ভর করে দুঃশাসন চালিয়ে তার পরিণতির দিকে দেশকে এগিয়ে নেবেন, না সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবেন-তার দায়িত্ব তাদের উপর আমি ছেড়ে দিতে চাই।

- দৈনিক সংগ্রাম, ২০ জুলাই, ২০১০

www.pathagar.com

ইল্লত যায় না ধুইলে স্বভাব যায় না মইলে

– ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন

ইতিহাসকে পাতিহাঁস বানানোর বহু নজির এই উপমহাদেশে রয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারাঠা দস্যু শিবাজীকে জাতীয় বীর বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকরা যখন শিবাজী যুগের ঐতিহাসিকদের বই-পুস্তক থেকে তার আসল চেহারা প্রকাশ করতে শুরু করলেন তখন তিনি ও তার সুহৃদরা লজ্জা পেয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত রানা প্রতাপ সিং নামক এক রাজপুতকে খুঁজে বের করা হলো যিনি মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার না করে বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য এর আগে বাংলার বার ভূঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যকে বাংলার বীর হিসেবে প্রমাণ করার বিস্তর কোশেশ করা হয়েছিল। কিন্তু শিবাজীর মতো তারও আসল চরিত্র বের হয়ে গেলে এবং একজন বাঙালি জমিদারকে সর্বভারতীয় হিন্দুরা জাতীয় বীর মানতে অস্বীকার করলে শেষ পর্যন্ত সবে ধন নীলমণি রানা প্রতাপ সিংকে আবিষ্কার করা হয়েছিল। এই রানা প্রতাপ সিং-এর আধুনিক বংশধরদের নিয়ে কিছু মজার ঘটনা শোনা যায়। ভারতের উত্তর প্রদেশে একটা সম্প্রদায় রয়েছে যাদের স্ত্রীরা পালঙ্কে শোয়, আর স্বামীরা শোয় মাটিতে। আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, এরা রানা প্রতাপ সিং-এর বংশধর।

মোগল শাসকদের হামলা থেকে বাঁচবার জন্য দীর্ঘদিন তারা আত্মগোপন করেছিলেন। সরাসরি যুদ্ধ ও চোরাগুপ্তা হামলা করতে গিয়ে তাদের অনেকে নিহতও হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত রানা পরিবারের মেয়েদের বিবাহসাদী

www.pathagar.com

একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। রাজবংশীয় বর পাওয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে রানা পরিবারের মেয়েরা রাজপুত পরিবারের স্বামী না পেয়ে চাকর নফরদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই চাকর নফররা সর্বদা হাত জোড় করে মাথা নিচু করে হুকুম তামিলের জন্য রাজকন্যাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো। এখন ঘটনা পরম্পরায় তাদের স্বামী হয়েও তারা পুরাতন অভ্যাস সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেনি। এরা স্ত্রীদের সাথে এক পালঙ্কে ঘুমুতে সংকোচবোধ করেছে। পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে বংশানুক্রমে এই প্রথা চালু হয়ে যায় যা আজও বহাল রয়েছে।

ইতিহাস আলোচনা আমার আজকের বিষয়বস্তু নয়। তবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃবৃন্দের আচরণ দেখে রানা প্রতাপের বংশধরদের ঘটনাটি আমার মনে পড়লো। গণতন্ত্রের সাথে এই দলটির সম্পর্ক অনেকটা Marriage of Convenience এর হলেও দলটি কখনো এই মূল্যবোধের সাথে সহাবস্থান করতে পারেনি। রানা প্রতাপের বংশধরদের ন্যায় গণতন্ত্রের সাথে এই দলটি এক পালঙ্কে শুতে পারে না, তারা পালঙ্কের নিচে মাটিতে শোয়। এর কারণ সুস্পষ্ট।

গত ৫ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সাবলীল ভাষায় বহুল নিন্দিত বাকশালকে তার দলের রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন। বলাবাহুল্য রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে বাকশাল ছিল চরম স্বৈরাচারী, সেখানে ভিন্ন মতের সুযোগ ছিল না, বিরোধীদল ছিল না, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না। ১৯৭৫ সালে এই বাকশালকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মৌলিক মানবিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটা অংশের উদ্যোগে সামরিক বাহিনীর সহায়তায় একটি রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটে এবং এতে সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। দেশের নিগৃহীত ও অধিকার বঞ্চিত সাধারণ মানুষ তখন এই বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছিল। এর পর ২১ বছর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারেনি। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা অতীতে বাকশাল প্রতিষ্ঠা ও দমন-নিপীড়নের জন্য হাত জোড় করে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে জনসমর্থন

www.pathagar.com

কুড়ান এবং ক্ষমতায় আসেন। মানুষ মনে করেছিল তারা বাকশালের ধারণা পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের ধারণা সত্য নয়। শাসন ক্ষমতায় এসে তাদের আচরণও প্রকৃতপক্ষে বাকশালের পরিপূরক। হানিফ তা আরও পরিষ্কার করে দিলেন। দলটির সভানেত্রী অথবা সাধারণ সম্পাদক হানিফের ঘোষণার প্রতিবাদ না করায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট হলো। বলাবাহুল্য বাকশাল সম্পর্কে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জ্ঞান খুবই সীমিত। এদের মধ্যে যারা এর নাম শুনেছেন তারা এর বিশদ বিবরণ ও তাৎপর্য সম্পর্কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সম্যক ওয়াকিবহাল নন। এ প্রেক্ষিতে এ পর্যায়ে বাকশালের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেয়া আমি জরুরি মনে করছি। স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে বাকশাল দর্শন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কবর রচনা ও একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বাকশাল কায়েমের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটা স্থবিরতা নেমে এসেছিল। দেশবাসী জরুরি অবস্থা জারির মাধ্যমে মানুষের সকল প্রকার মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করে দেশে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল যাতে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ বা মিটিং মিছিল করতে না পারে। এর ওপর রক্ষীবাহিনীর নির্মমতার হুমকি তো ছিলই। ৪র্থ সংশোধনী ও বাকশাল প্রতিষ্ঠার ফলে যে পরিবর্তনগুলো এসেছিল তা ছিল নিম্নরূপ :

১) বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়।

২) সকল রাজনৈতিক দল বেআইনী ঘোষণা করা হয় এবং তার স্থলে দেশে বাকশাল নামে একটা মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে বলে নির্ধারণ করা হয়। এই বাকশাল তথা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ ছিল প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগের একনায়কতান্ত্রিক সংস্করণ।

৩) সরকারি কর্মচারীদের রাজনীতিকীকরণ করে তাদেরও নতুন রাজনৈতিক দলের সদস্য করা হয়।

www.pathagar.com

৪) শাসনতন্ত্রের সংশোধনীর মাধ্যমে স্থির করা হয় যে, বাকশালের অনুমোদন ব্যতিরেকে কেউ রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য হতে পারবে না। তদুপরি নতুন দলে যোগদান না করলে বিদ্যমান সংসদ সদস্যরাও তাদের সদস্যপদ হারাবেন।

৫) আবাদী জমি ও গ্রামীণ অর্থনীতির সমষ্টিকরণের লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে সমবায় সমিতি গঠন করে সোভিয়েত রাশিয়ার কলখজ ও সভখজের অনুকরণে জমির ব্যক্তি মালিকানা সমবায় সমিতির ওপর ন্যস্ত করার কথা ছিল। সামষ্টিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ও সমবায় সমিতি ও তার সদস্যদের মধ্যে মালিকানার অনুপাতে উৎপাদিত ফসলের বণ্টন ছিল-এর লক্ষ্য।

৬) মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করা হয়।

৭) সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। দেশের সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমে বেআইনী ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় দু'টি এবং দলীয় মালিকানায় দু'টি দৈনিক তথা মোট ৪টি পত্রিকা রাখা হয়। দলীয় ও রাষ্ট্রীয় বন্দনাই ছিল এর লক্ষ্য। বাকশালের চরম স্বৈরাচারী দর্শনে ভিন্ন মতের সুযোগ ছিল না। বিরোধী দল বলতে কিছু ছিল না। এই দর্শন কার্যকর করতে গিয়েই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সরকারের সমালোচনার স্বাধীনতাকে কেড়ে নেয়া হয়।

৮) জেলার সংখ্যা ৬১তে উন্নীত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলায় দলীয় রাজনীতিক এবং পছন্দের ব্যক্তিদের গবর্নর নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেক গবর্নরের কর্তৃত্বে সেনাবাহিনীর একটি ইউনিটও ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়, কথা ছিল এভাবে সেনাবাহিনীকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

৯) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ব্যাপারে বিচার শাখার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। তার পরিবর্তে একটি সাংবিধানিক আদালত বা ট্রাইব্যুনাল গঠনের

www.pathagar.com

জন্য সংসদকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতিই সুপ্রীমকোর্টের বিচারকদের নিয়োগ করার একমাত্র কর্তৃপক্ষে পরিণত হয়। প্রধান বিচারপতি তার সুপারিশ করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। রাষ্ট্রপতি তার অভিপ্রায় মাফিক সুপ্রীমকোর্টের বিচারকদের অপসারণ করারও অধিকারী হন। তিনি বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতার অধিকারী হন।

১০) সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে সরকার ব্যবস্থাকে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হয়।

১১) রাষ্ট্রপতি পদে থাকার কোনও মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়নি। ৪র্থ সংশোধনীয় এই বিধান রাখা হয় যে, তিনি যতকাল ইচ্ছা ততকাল রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন। জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অথবা নির্বাচনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করার (Impeachment) ব্যবস্থা রাখা হলেও এর কর্মপদ্ধতি এতই কঠিন করা হয় যে, অভিশংসন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

১২) রাষ্ট্রপতিকে সংসদ সদস্য না হলেও যে কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগ করার ক্ষমতা দেয়া হয়। বাকশাল ব্যবস্থায় কোনও রকম প্রতিবিধায়ক ও ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা না রেখেই সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়।

শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ও সংসদকে দলীয় কর্তৃত্বে এনে একটি চরম স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করাই ছিল এর লক্ষ্য। দেশবাসী এতে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। যে শেখ মুজিব গণতন্ত্রের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন, জেল খেটেছেন ক্ষমতায় এসে সেই শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করে গণতন্ত্রের কবর রচনা করবেন একথা অনেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, বাম কমিউনিস্টদের চাপে পড়ে তিনি এই কাজটি করেছেন। অনেকে আবার একথাটি বিশ্বাস করতে চান না। তাদের বিশ্বাস, A man is known by the company he keeps. কাজেই বাকশাল প্রতিষ্ঠার দায় এড়িয়ে যাওয়া খুবই

www.pathagar.com

কঠিন। যাই হোক এরপর পদ্মা মেঘনা যমুনার পানি অনেক দূর গড়িয়েছে। ইতিহাসের নির্মম ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। জেনারেল জিয়া দৃশ্যপটে এসেছেন এবং সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বাতিল হয়েছে, বাকশাল দর্শনের পতন ঘটেছে এবং বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা ধারণা করেছিলাম একদলীয় দর্শনের মুখ আমরা আর দেখবো না। কিন্তু হা হতস্মি মন্দ ভাগ্য! ইল্লত যায় না ধুইলে, খাসলত যায় না মইলে। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবুল আলম হানিফ প্রাচীন এই বাংলা প্রচলনটি পুনরায় সত্য প্রমাণ করলেন।

অবশ্য আওয়ামী লীগ যে গণতন্ত্রবান্ধব একটি দল নয়, নিকৃষ্ট ফ্যাসিবাদ তাদের বৈশিষ্ট্য, অতীতে তারা বহুবার তা প্রমাণ করেছে। দলটির ক্ষমতার মোহ ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র এই দেশে কখনো গণতন্ত্রকে শিকড় গাড়তে দেয়নি।

পাকিস্তান আমলের পুরো সময়টাই আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পদদলিত করে সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকরা দুঃশাসন, নির্যাতন, দলন-নিপীড়নের আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের এই নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনই পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয় এবং লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনই ছিল স্বাধীনতার আন্দোলনের মূল চেতনা। অদৃষ্টের পরিহাস স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ প্রথম সুযোগেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে হত্যা করে। তারা দেশে লুটপাটে রাজত্ব কায়েম করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, আওয়ামী লীগ যদি বাকশাল না করতো, দেশকে লুটপাট সমিতিতে রূপান্তর না করতো, তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত না করতো, রাজনৈতিক নির্যাতন না চালাতো এবং মানুষকে তার মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত না করতো তাহলে এদেশের ইতিহাস ভিন্নভাবে লিখা হতো। কিন্তু তা হয়নি। পরিবর্তনের শ্লোগান দিলেও দলটির চরিত্র অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানী শাসনামলের ২৪ বছরের শাসনামলে তারা তা একাধিকবার প্রমাণ করেছে। ১৯৫২ সালের আদমজী রায়ট এবং ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানী শাসকদের ৯২-ক ধারা জারি ও তার ফলে সৃষ্ট জনদুর্ভোগের জন্য এই দলটিই দায়ী ছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়-উত্তর ইতিহাসও আমাদের একথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ২১ দফার ভিত্তিতে সেই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল কিন্তু লুটপাটের ভাগাভাগির প্রশ্নে বিরোধ দেখা দেয়ায় এই দলটি যুক্তফ্রন্টের সাথে থাকতে পারেনি। পরবর্তী সময় মরহুম আতাউর রহমানের নেতৃত্বে নিজেরাই সরকার গঠন করেছিল। তারপর নিজেদের মধ্যে ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেলে বিরক্ত হয়ে মওলানা ভাসানী বেরিয়ে গিয়ে ন্যাপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। সংসদের স্পীকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফ্রি স্টাইল মারামারি করতে গিয়ে নিজ দলীয় ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলেন। জনৈক সদস্য তাকে মাইকের ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করেছিলেন। সেই আঘাতটি এতই প্রচণ্ড ছিল যে, মাথায় রক্তক্ষরণের কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের এই মারামারি এবং ডেপুটি স্পীকারের মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞকে উপলক্ষ্য করে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন এসেছিল। গণতন্ত্রের স্বপ্ন তখন এভাবে ধুলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল এবং সুদীর্ঘ ১১ বছর ধরে আমাদের ঘাড়ে সামরিক স্বৈরতন্ত্র জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিল। এই স্বৈরাচারকে অপসারণ ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল লড়াই করেছে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অকুতোভয় জামায়াতে ইসলামীর আপোষহীন সংগ্রাম আইয়ুবশাহীকে স্বৈরাচারের দুর্গকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল এবং ১৯৬৪ সালে তারা উভয় প্রদেশে জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। উচ্চ আদালতের রায়ে জামায়াত তার রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পেয়েছিল। আওয়ামী লীগও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে ঐ সময় জামায়াতের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে। তবে এই দলটিকে মানুষ যখনি বিশ্বাস করেছে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের

www.pathagar.com

প্রতিভূ মনে করেছে তখনি আশাহত হয়েছে। তারা নিজেরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, স্বৈরাচারের নিকৃষ্টতম ভূমিকা পালন করেছে এবং সামরিক শাসনের পটভূমি তৈরি করেছে এবং এমনকি ক্ষমতায় যাবার পথকে নিষ্কুন্টক করার জন্য সামরিক শাসনের উস্কানি দিয়েছে। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনকে তারা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে জেনারেল নাসিম ক্যু'র চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ২০০৭ সালের সেনাসমর্থিত কেয়ারটেকার সরকার তাদেরই আন্দোলনের ফসল ছিল এবং এই সরকার যাবতীয় অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার ব্যাপারে তারা বার বার শুধু প্রতিশ্রুতি দেননি, বৈধতাও দিয়েছেন। অগণতান্ত্রিক এই কেয়ারটেকার সরকারের লেজ ধরেই আঁতাতের নির্বাচনে ক্ষমতায় এসে তারা বহুদলীয় গণতন্ত্রের সকল মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে চলেছেন। শাসন ও বিচার ব্যবস্থা তাদের হাতে এখন পর্যুদস্ত। গণতন্ত্রের শ্লোগান দিয়ে তারা মানুষের সাথে প্রতারণা করেছেন। এজন্যই বলছিলাম আওয়ামী লীগ ও গণতন্ত্র সমার্থক নয়। গণতন্ত্রের সাথে এক পালংকে শোয়ার মর্যাদা ও যোগ্যতা দলটি অদ্যাবধি প্রদর্শন করতে পারেনি। কাজেই আওয়ামী লীগের কাছ থেকে গণতন্ত্র আশা না করে দেশের মানুষকেই তা ছিনিয়ে আনতে হবে বলে আমি মনে করি।

- দৈনিক সংগ্রাম, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১০

www.pathagar.com

প্রশাসন ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতীয় হস্তক্ষেপ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে

– ড. মুহাম্মদ নূরুল আমীন

ভারতের বহুল প্রচারিত পাইওনিয়ার পত্রিকা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে রক্ষার লক্ষ্যে সম্প্রতি ভারত সরকারের আরো কিছু করা দরকার বলে মত প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটির ২০ নবেম্বর সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের সাথে অনেক চুক্তি করলেও ভারত সরকার সেগুলো বাস্তবায়নে বিলম্ব করছে এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করায় বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার সমস্যায় পড়েছে, তার বিরুদ্ধে দেশ বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। পত্রিকাটি ভারত সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে শেখ হাসিনার বদলে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হলে ভারত বেশ সমস্যায় পড়বে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের প্রাক্কালে উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির পর দুদেশের সম্পর্কে নাটকীয় উত্থান ঘটলেও তা আবার চুপসে যায়। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে এই অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে যে সেই সফরে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। এতে বলা হয় যে, শেখ হাসিনার সফরের ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও সমঝোতা অনুযায়ী ভারতে বাংলাদেশী পণ্য আমদানির ওপর আরোপিত শুল্ক ও শুল্ক বহির্ভূত প্রতিবন্ধকতাগুলো সরানো হয়নি। দু'দেশের মধ্যে আরো অনেক সমঝোতা হয়েছিল। বাংলাদেশের তুলার চাহিদার ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ ভারত থেকে আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে নয়াদিল্লী বাংলাদেশে ১১

www.pathagar.com

লাখ বেল তুলা রফতানির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বাংলাদেশ ১.৩৫ লাখ বেল তুলা আমদানির লক্ষ্যে এলসিও খুলেছিল। কিন্তু ভারত তার অভ্যন্তরীণ মূল্য নিয়ন্ত্রণের অজুহাত তুলে রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। গত জানুয়ারি মাসে শেখ হাসিনার সাথে চুক্তির প্রাক্কালে ভারত বাংলাদেশ থেকে ১৭ লাখ পিস পোশাক আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এতে বাংলাদেশ খুশী হয়েছিল। এই আমদানি ছিল SAFTA চুক্তির অধীনে প্রতিশ্রুত বাংলাদেশ থেকে ৮০ লাখ পিস পোশাক আমদানির অতিরিক্ত। ভারত নানা অজুহাত দেখিয়ে এর কোনটিই বাস্তাবায়ন করেনি। ভারত বাংলাদেশে তিন লাখ টন চাল ও দু'লাখ টন গম নিয়ে মোট ৫ লাখ টন খাদ্যশস্য রফতানির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেনি। দেশটি বিএসটিআই সনদের শর্ত প্রত্যাহার এবং ভারতের ওপর দিয়ে বাংলাদেশ-নেপাল ট্রাক চলাচলের সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করা হয়নি। চুক্তির প্রাক্কালে বিশেষ করে ৪৮০টি স্পর্শকাতর আইটেম থেকে ৬১টি বাদ দিয়ে বাকি ৪১৯টি পণ্য শুল্কমুক্তভাবে ভারত বাংলাদেশ থেকে আমদানি করার আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকার এই আশ্বাসটিও পূরণ করেনি। হাসিনা-মনমোহন সিং সমঝোতা অনুযায়ী তিনবিঘা করিডোরের ওপর দিয়ে একটি ফ্লাইওভার তৈরি করে দেয়ার কথা ছিল। তাও হচ্ছে না। বলাবাহুল্য, ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি অনুযায়ী এই তিনবিঘা করিডোরটি বাংলাদেশকে হস্তান্তর করার কথা ছিল। কিন্তু হস্তান্তরতো দূরের কথা তার ওপরে প্রতিশ্রুত ফ্লাইওয়ারও এখন আর হচ্ছে না।

পাইওনিয়ারের রিপোর্টে বলা হয়, ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়ায় শেখ হাসিনা ও ভারত উভয়ের অভিন্ন শত্রু বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও জামায়াতে ইসলামীকে এই দাবি করার সুযোগ এনে দিয়েছে যে শেখ হাসিনা নয়াদিল্লীর কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উলফার অরবিন্দ রাজ খোয়ার মতো জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। ভারতবিরোধী ইসলামী জঙ্গিদের বাংলাদেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এসব করার কারণে শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লীর চাপের মুখে শর্তহীন ছাড় দেয়ার

www.pathagar.com

অভিযোগ উঠছে। এতে আরো বলা হয়, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ব্যাপক জয় পেলেও মাঝামাঝি মেয়াদে এটা বিরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। ভারত অবশ্য শেখ হাসিনাকে সহায়তা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারে। পাইওনিয়ারের মতে, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার অনিশ্চিত নিরাপত্তা পরিবেশ ২০১৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই বছরই আমেরিকানরা আফগানিস্তান থেকে চলে যাবে। এরপর আল কায়েদা-তালেবান দেশটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে। তখন পাকিস্তানও ভারতের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালাতে পারে। প্রবল ভারতবিরোধী হিসেবে পরিচিত বেগম খালেদা জিয়া তখন বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকলে ভারতকে দুই ফ্রন্টে লড়াই করতে হবে। ভারতের বহুল প্রচারিত পত্রিকাটির দীর্ঘ এই রিপোর্ট থেকে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এক. আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান মহাজোট সরকার ভারতের আশীর্বাদে ক্ষমতায় এসেছে এবং ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট। তারা ভারতের দাবি অনুযায়ী তাদেরকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু ভারত তার বিনিময়ে বাংলাদেশকে যে সুযোগ-সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা কার্যকর না করায় শেখ হাসিনার সরকারকে অভ্যন্তরীণ সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে। ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দেয়ার অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে উঠেছে। দুই. ২০০৮ সালে ব্যাপক জয় পেলেও মাঝামাঝি সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়ে অবস্থার অবনতি ঘটেছে এবং ভারত শেখ হাসিনাকে সহায়তার মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে। তিন. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও জামায়াতে ইসলামী শেখ হাসিনা ও ভারত উভয়ের অভিন্ন শত্রু। চার. ভারতের দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উলফার অরবিন্দ রাজ খোয়ার ন্যায় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে। ভারতবিরোধী ইসলামী জঙ্গিদের বাংলাদেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, জঙ্গি নাম দিলেও প্রকৃতপক্ষে শেখ হাসিনার সরকার যা করছেন তা হচ্ছে বাংলাদেশের মাটি থেকে জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী সকল দলকে উৎখাত করা। পাঁচ. আগামী ২০১৪ সালের অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনার ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ভারতের

www.pathagar.com

জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তিনি ক্ষমতায় না আসলে বাংলাদেশে ভারতীয় স্বার্থ যেমন বিপন্ন হবে তেমনি ভারত আরো নানামুখী সমস্যায় পড়বে। ২০১৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ছেড়ে যাবে এবং তালেবান আল-কায়েদা দেশটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে। ভারতের জন্য এক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এই সুযোগে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালাতে পারে। এই অবস্থায় বাংলাদেশে যদি খালেদা জিয়ার মতো কট্টর ভারতবিরোধী ব্যক্তি ক্ষমতায় আসে তাহলে ভারতকে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে হবে।

পাইওনিয়ারের এই রিপোর্টটির পর আওয়ামী লীগ-ভারত আঁতাত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দেশটির নগ্ন হস্তক্ষেপে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য তার সর্বগ্রাসী তৎপরতা, এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রতিনিধিদের শত্রু ঘোষণা করে তাদের উৎখাতের বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ এবং একটি দল ও গোষ্ঠীকে ক্ষমতা, অর্থবিত্ত ও সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে দেশ ও তার জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ এখন কারা চালাচ্ছেন সে সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা-কল্পনা চলে আসছিল। এখন অনেকের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার যে ভারতীয় নীলনকশা ও দিক-দর্শনের ভিত্তিতেই এখন বাংলাদেশ পরিচালিত হচ্ছে। ভারত যাদের শত্রু মনে করছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারও তাদের শত্রু মনে করে নিশ্চিহ্ন করার পথে নেমেছে। তারা এখন কাউকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে না।

প্রসঙ্গত: আমি এখানে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক-কলামিস্ট নিরোদ চৌধুরীর একটি প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করতে চাই।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ভারত কি মাত্রায় খুশী হয়েছিল তার একটা বর্ণনা পড়েছিলাম নিরোধ চৌধুরীর একটি নিবন্ধে। Expectation from New Government in Bangladesh শিরোনামে লিখিত এই নিবন্ধটি দৈনিক New Nation পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল। নিরোধ চৌধুরী লিখেছিলেন, শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের ২৪ ঘণ্টা পার না হতেই হঠাৎ মধ্যরাতে আইকে গুজরালের বাসায় টেলিফোন

www.pathagar.com

বেঁজে উঠলো। বিস্ময়ের সাথে শ্রী গুজরাল দেখলেন, অপর প্রান্ত থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ হ্যালো বলছেন। তিনি এতে সম্পর্কের উষ্ণতা অনুভব করলেন। তার মধ্যে হঠাৎ করে মুক্তিযুদ্ধের Sentiment ফিরে আসলো। ২১ বছর আগে শেখ মুজিবের মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধুত্বের যে অনুভূতির কবর রচিত হয়েছিল হঠাৎ তা জেগে উঠে দুকূলকে প্লাবিত করলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত সহায়তা করেছে। তাদের অনেক সৈন্য প্রাণ দিয়েছে। শুনতে অদ্ভুত লাগবে, তাদের স্মরণে বাংলাদেশে কোনও স্মৃতি স্তম্ভ তো দূরের কথা একটা ইট দিয়ে তার চিহ্নও রাখা হয়নি। প্রবন্ধে আশা প্রকাশ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ এই স্মৃতিকে জিইয়ে রাখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তবে ধারণা অনুযায়ী শেখ হাসিনার সরকার যে সময় ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর যৌথ রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত হচ্ছিল সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে চায়। তিনি লিখেছিলেন ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সালমান হায়দার ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে তার প্রথম সফরে আওয়ামী লীগ সরকারের বন্ধুত্বের উষ্ণতা অনুভব করে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। যে আমলারা পূর্ববর্তী সরকারের আমলে নিশ্চুপ ছিলেন আস্তে আস্তে তারা সহজ হচ্ছেন। এই নিবন্ধটিতে তথ্য প্রকাশ করে বলা হয়েছিল যে, সালমানকে দিয়ে ভারত সরকার তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে পাঁচটি ভারতীয় দাবি পূরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই দাবিগুলো হচ্ছে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের উপর দিয়ে নৌ ও স্থল ট্রানজিট প্রদান, চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ নদী-বন্দর ব্যবহারের সুবিধা প্রদান, গ্যাস ও কয়লা ব্যবহারের সুবিধা প্রদান এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য প্রদান প্রভৃতি। নিরোদ চৌধুরীর প্রবন্ধে এই সুবিধাসমূহের বিনিময়ে ফারাক্কার ব্যাপারে বাংলাদেশকে কিছু ছাড় প্রদান বিশেষ করে একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয় এবং বলা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে আবেগের দিক থেকে ফারাক্কা হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য একটি কাশ্মীর, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিসসা না পেলে বাংলাদেশের মানুষ ভারতকে উপরোক্ত সুবিধাগুলো দেবে না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, শেখ হাসিনা সরকারের উপরোক্ত মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) ভারত তার বাঞ্ছিত সুবিধা আদায় করতে পারেনি। তবে সম্পর্কের বরফ গলায় সাহায্য করার জন্য গঙ্গার পানি

www.pathagar.com

ভাগাভাগির ব্যাপারে পাঁচ বছরের পরিবর্তে ৩০ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি করে চমক সৃষ্টি করেছিল। এই চুক্তিতে কোনও গ্যারান্টি ক্লজ ছিল না। বাংলাদেশকে নির্ধারিত পরিমাণ পানি দেয়া না হলে কি হবে তারও কোনও উল্লেখ ছিল না। ফলে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হলেও বাংলাদেশ গঙ্গার পানির ন্যায্য হিসসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। হাসিনা সরকারের নীতি পলিসি, নিবর্তন-নির্যাতনমূলক কার্যক্রম এবং সর্বাত্মক ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত ২০০১ সালের নির্বাচনে তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী দলসমূহের জোট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। ফলে ভারত বাংলাদেশ থেকে তার অবৈধ সুবিধা আদায়ে ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতা আওয়ামী লীগ মেনে নিতে পারেনি এবং এ প্রেক্ষিতে ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই তারা এই জোটের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড শুরু করে দেয়। এখন এটা পরিষ্কার যে সহযোগী হিসেবে ভারত তাদের সর্বাত্মক মদদ দিয়েছে। দেশ ও সরকারকে অকার্যকর করা, ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জেএমবির সৃষ্টি ও দেশব্যাপী বোমাবাজি এবং এমনকি শেখ হাসিনার উপর গ্রেনেড হামলার পেছনেও এদেশীয় অপশক্তি এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ষড়যন্ত্র ছিল। দীর্ঘকাল ধরে বাইরে থেকে ইসলামের ও ইসলামপন্থীদের কোনও ক্ষতি করতে না পেরে তারা কৌশল পরিবর্তন করে এবং ইসলামপন্থী সেজে একশ্রেণীর অদূরদর্শী আলেম নামের কলংককে পুঁজি করে একের পর এক অপকর্মে লিপ্ত হয়। চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে এটা যে একটা ষড়যন্ত্র ছিল তার আরেকটি প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয় থিংক ট্যাংক ভাস্কর রায়ের সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধ থেকে। 'র' এর সাবেক এই কর্মকর্তা South Asia Analysis Group এর অন্যতম পুরোধা শ্রী ভাস্কর রায় তার নিবন্ধে বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটকে ভারতবিরোধী জোট হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে, এই জোট উত্তর-পূর্ব ভারতের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্য উলফাকে অস্ত্রসজ্জিত করেছে, বাংলাদেশ ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভারতে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইকে অনুমতি দিয়েছে এবং এমনকি বাংলাদেশকে পাকিস্তানের কনফেডারেশনভুক্ত করার কাজও যথেষ্ট এগিয়ে নিয়ে গেছে। তার ভাষায়।

www.pathagar.com

"BNP, the Jamaat and the other pra Pakistan groups formed an alliance against India. It is also alleged that during the BNP-JEI government (2001-06) work was in an advanced stage to convert Bangladesh into a loose Confederation of Pakistan. During her Second term Begum Zia did everything to a) destabilize north-east India by heavily arming the separatist, specially ULFA b) allow Ist to launch terroist attack in India using Bangladesh as a launching ground c) grenade attack on Hasina to kill her."

ভাস্কর রায় শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও ভারতীয় বন্ধুত্বের সর্বশেষ প্রতীক বলে মনে করেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোকে বাংলাদেশের মুসলমানদের শত্রু হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার মতে এই দেশগুলোর ১২০টি সংগঠন সমাজ সেবা ও দারিদ্র্য বিমোচনের নামে জঙ্গি তৎপরতার সাথে জড়িত রয়েছে। তাদের তৎপরতা বন্ধ করেও কোনও ফল হচ্ছে না। কেননা আমলাতন্ত্রসহ দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে ঢুকে পড়েছে যে, তাদের নির্মূল করা খুবই কঠিন কাজ।

এখানে একটি বিষয় আমাকে বিস্মিত করেছে। ভারত এবং বাংলাদেশ দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। আন্তর্জাতিক আইন বিধি-বিধান ও নিয়মনীতি অনুযায়ী একটি স্বাধীন দেশ আরেকটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এই হস্তক্ষেপ একটি স্বাধীন জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে। আবার একটি দেশের কোনও রাজনৈতিক দলকে আরেকটি দেশ শত্রুও গণ্য করতে পারে না। কোন দেশ তাদের শত্রু, কোন দেশ তাদের মিত্র এই নির্দেশনাও তারা দিতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত: ভারত বরাবরই এই কাজটি করছে এবং তাদের আচার আচরণের মাধ্যমে বলে দিচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে থাকার অধিকার বাংলাদেশের নেই। তারা যা বলবে বাংলাদেশকে তাই করতে হবে। তারা যা চাইবে তা তাদের দিতে হবে। তারা যাদের ক্ষমতায় আনতে চাইবে তারাই ক্ষমতায় আসবে। তারা যাদে নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে এ দেশের পুতুল সরকার তাদের নিশ্চিহ্ন করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

ভারত মুক্তি যুদ্ধের আমাদের সাহায্য করেছে এ কথাটি আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই সাহায্য যে নিঃস্বার্থ ছিল না এ কথাটিও আমরা ভুলতে পারি না। পাকিস্তানী সৈন্যদের ফেলে যাওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র, পাটকল, বস্ত্রকল ও চিনিকলের মূল্যবান যন্ত্রপাতি এবং ব্যাংক লুটের সোনাদানা সবই তারা নিয়েছেন। এ দেশের পাট শিল্প ধ্বংস করেছেন। ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানিয়েও তারা ক্ষান্ত হননি আরো ৫৪টি নদীর উৎস মুখে বাঁধ দিয়ে আমাদের কৃষি ব্যবস্থা ও পরিবেশ প্রতিবেশ ধ্বংসে লিপ্ত রয়েছেন। তবুও তারা আমাদের বন্ধু। এ দেশের মানুষ তাদের শত্রু মনে করেন না। তেমনি মনে করেন না সে দেশের কোনোও রাজনৈতিক দলকেও। কিন্তু তারা আমাদের তাই মনে করেন। তাদের দৃষ্টিতে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগই তাদের একমাত্র বন্ধু এবং কার্যত আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বিনিময়ে ভারতীয় এজেন্ডাই এ দেশে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রভুদের খুশি করেই তারা ক্ষমতায় থাকতে চান।

শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের তারা অনেক উপকার করেছেন। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে আদালতের রায়ে যখন সাজা পাওয়ার পর্যায়ে তারা পৌঁছে যান, শেখ হাসিনাকে তার আন্দোলনের ফসল কেয়ারটেকার সরকার দেশের নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক ঘোষণা করে নির্বাসনে পাঠানোর চেষ্টা করেন তখনি কূটনৈতিক তৎপরতায় তাকে উদ্ধার করা হয় এবং জেনারেল মইন উকে প্রভাবিত করে ক্ষমতায় আনার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করা হয়। এই ঋণ পরিশোধ করার মতো নয়। বিএনপিকে পরিকল্পিতভাবে পঙ্গু করে দেয়ার চেষ্টা করা হয় এবং উঠতি ইসলামী শক্তি হিসেবে জামায়াতকে তারা টার্গেট করে নেয়। ২০০৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় থিংক ট্যাংক হিরন্ময় কার্লেকার তার এক নিবন্ধে জামায়াতকে প্রতিহত করার জন্য ভারত সরকারের প্রতি সুস্পষ্ট আহ্বান জানান। দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে জামায়াতের দু'জন মন্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ধরা না পড়ায় ভারতে একটি গোষ্ঠী হতাশ হয়ে পড়েন। কার্লেকার ছিলেন এদেরই দলভুক্ত। তিনি লিখেছেন, "The fact that while the drive has devastated the BNP and Awami Leage, the Jamaate Islami and its offshoots

www.pathagar.com

remain intact which will give them a huge advantage in next Parliamentary elections. Can India remain a spectator given the Jamaat's pathological hatred for the country?"

জামায়াতকে তারা ভয় পায় এবং নির্বাচনে তারা নীরব দর্শক ছিলেন না। তাকে প্রতিহত করার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন এবং কারচুপির মাধ্যমে তাকে প্রহসনে পরিণত করে পছন্দের দলকে ক্ষমতায় এনে প্রথম সুযোগেই নিজেদের স্বার্থ আদায় করে নিয়েছেন। কিন্তু দেয়ার ব্যাপারে নির্লিপ্ততা অবলম্বন করেছেন। একেই বলা হয়, আদানে ক্ষীপ্রকারিতা, প্রতিদানে চিরায়ূতা। বাংলাদেশ সরকার এখানে পুতুল মাত্র। ভারতীয় নির্দেশনায় এখন দেশ চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যুদ্ধাপরাধের বানোয়াট অভিযোগও তাদের সৃষ্টি। এই ইস্যুটি ভাস্কর রায়, সন্দীপ দীক্ষিত ও হিরন্ময় কার্লেকার প্রমুখ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে জন্ম দেয়া হয়েছে। শুধু লিখনির মাধ্যমে নয়, কোনো কোনো ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশে এসেও উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে এই ইস্যুকে চাঙ্গা করার প্ররোচনা দিয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করে এ দেশে আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য তাকে বন্ধুহীন করার চেষ্টাও চলছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশী এই হস্তক্ষেপ এবং বাইরের নির্দেশনায় দেশের আইনানুগ ও দেশপ্রেমিক দল ও শক্তির উপর নির্যাতন, আইন-শৃঙ্খলার অব্যাহত অবনতি, দ্রব্যমূল্যের উল্লম্ফন এবং জনজীবনের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান না করে আধিপত্যবাদ তোষণের বিদ্যমান সরকারি প্রবণতায় দেশের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। সরকার যদি নিজের ও দেশের কল্যাণ চান তাহলে স্বাধীন দেশের স্পিরিটকে সামনে রেখে ইনসাফ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়া উচিত বলে আমার বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে বিদেশী ডিক্টেশন তাদের কোনও কাজে লাগতে পারে না।

– দৈনিক সংগ্রাম, ২৩ নবেম্বর ২০১০

www.pathagar.com

নূহ (আঃ) এর কিস্তি পরিষ্কার আওয়ামী লীগ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার

– ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন

হযরত নূহ (আঃ) এর কিস্তির গল্প পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে। আল্লাহর এই নবীর সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট লোকেরা যখন তার নবূয়তকে অস্বীকার করে তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করলো, আল্লাহর পথ নির্দেশকে অস্বীকার করে অন্যায়, অবিচার, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনকে সামাজিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত করলো এবং নূহ (আঃ) তাদের সৎ পথে ফিরিয়ে আনার সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেন তখন তিনি আল্লাহর সাহায্য কামনা করলেন। আল্লাহ তাদের উপর গযব নাযিল করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নূহ (আঃ) কে প্রলয়ঙ্করী বন্যার খবর দিয়ে একটি বিশাল জাহাজ তৈরির নির্দেশ দিলেন যাতে করে আল্লাহর অনুগত বান্দা এবং পশু-পাখীদের তাতে তুলে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। কখন সেই মহাপ্লাবন আসবে তাও তিনি তার নবীকে জানিয়ে দিলেন এবং বললেন, "যখন নির্দেশ আসবে, উনুন বিস্ফোরিত হবে এবং সেখান থেকে প্রবল বেগে তরল পদার্থ বের হতে থাকবে" তখন নৌকায় তুলে নেবে এক জোড়া করে প্রত্যেক প্রাণী, তোমার পরিবার, তবে পূর্বে যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আছে সে নয়। আর তুমি জালেমদের ব্যাপারে আমাকে বলো না, তারা ডুববে। যখন তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে নৌকায় উঠবে, তখন বলবে সকল প্রশংসা তো আল্লাহর, যিনি জালেম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করলেন এবং বল আমাকে, হে আমার রব আমাকে কল্যাণকরভাবে অবতরণ করাও আর তুমিই সর্বোত্তম অবতরণকারী"- (সূরা মু'মিনুন)।

www.pathagar.com

হযরত নূহ (আঃ) কাঠ দিয়ে বিশাল জাহাজ তৈরি করেছিলেন। এই জাহাজ দেখে তার সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত লোকদের উন্মত্ততা আরো বেড়ে গেল। তারা তাদের ঠাট্টা- বিদ্রূপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তারা নূহ (আঃ) এর কাছে গিয়ে বললো, আমরা যদি আমাদের আচরণ ও জীবন পদ্ধতির সংশোধন না করি তাহলে তুমি আমাদের মহা বিপর্যয়ের ভয় দেখিয়েছ। আমরা এই বিপর্যয় এখনি দেখতে চাই, তুমি তা নিয়ে আস। তা না হলে আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য করবো। তারা নূহকে অবিশ্বাস করলো। তাদের ধারণা, টাইগ্রীস নদী বিধৌত মেসোপটেমিয়া অববাহিকার উজানে সমুদ্র থেকে প্রায় ৮০০-৯০০ মাইল দূরে একটি ভূখণ্ড প্লাবিত হয়ে সমুদ্রের রূপ ধারণ করবে এবং তার উপর নূহের তৈরি জাহাজ সদৃশ সুবিশাল এই নৌকা ভাসবে, এটি নিতান্তই হাস্যকর একটি বিষয়। এই নৌকাকে তারা আরো হাস্যকর করার জন্য গণশৌচাগারে পরিণত করলো। নারী, পুরুষ, শিশু-কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ-বর্ণিতা সবাই গিয়ে সেখানে পায়খানা পেশাব করা শুরু করলো। নূহ বিদ্বেষ তাদের এতই চরমে উঠলো যে, তার তৈরি নৌকায় তারা পায়খানা পেশাব করাকে পুণ্যের কাজ বলে মনে করতে থাকলো। পায়খানা পেশাবে নৌকা শেষ পর্যন্ত কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল। এই অবস্থায় বয়সের ভারে ন্যুব্জ শতবর্ষী রোগাক্রান্ত এক বৃদ্ধা নাতি-নাতনীর সাহায্য নিয়ে এই পুণ্যে শরিক হবার জন্যে নৌকার কিনারে গিয়ে যেই বাহ্য করতে বসলো তখনি শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে মলের ভেতর পড়ে গেল। তার সাথী নাতি-নাতনীরা হায় হায় করতে লাগলো। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তারা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলো যে, এই বৃদ্ধা মলে ডুবে তার সকল প্রকার জ্বরা, ব্যাধি ও শারীরিক অসামর্থ্যতা থেকে মুক্ত হয়ে যৌবনের উচ্চাশ ও শক্তি সামর্থ্য ফিরে পেয়েছে। সে নৌকা থেকে নেমে তার আরোগ্যের কথা সবাইকে জানিয়ে দিল। মুহূর্তে খবরটি ছড়িয়ে পড়লো। নূহের কিস্তির মল এক মহৌষধে পরিণত হলো। আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা মল ভরা কিস্তিতে শরীর ভেজানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলো। হাজার হাজার লোক এভাবে কিস্তির মল গায়ে মেখে রোগমুক্ত হতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, গায়ে মাখার জন্য মল আর পাওয়া গেল না। তখন লোকজন নৌকা ধুয়ে সে পানি গায়ে মাখল এবং একই ফল পেলো। এভাবে নৌকাটি সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত ছিল। মহান আল্লাহ তাদের দিয়েই তার

www.pathagar.com

নির্দেশে তার নবীর তৈরি কিস্তি পরিষ্কার করালেন যারা তাকে অপবিত্র করেছিল। ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলামের গ্রেফতার, রিমান্ড, নির্যাতনের কথা পাঠকরা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। জামায়াতের অন্যান্য নেতাদের ন্যায় মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার এক ঠুনকো ও বানোয়াট মামলায় তাকে গত আগস্ট মাসে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তীকালে গোয়েন্দা অফিসে বসে তার বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি মামলা রুজু করা হয় এবং তাকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। বলাবাহুল্য, ইতোপূর্বে জনাব রফিকুল ইসলাম খানকে সরকার যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও স্থল, নৌ ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিদেশ যাত্রা বন্ধের লক্ষ্যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানী রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জনাব খান চার বছরের শিশু ছিলেন এবং তার পিতা স্বয়ং একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয় এবং সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকার তার বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধ মামলা না দিয়ে অপরাপর মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় তাকে হয়রানি করা অব্যাহত রেখেছে। সব মামলায় জামিন পাওয়া সত্ত্বেও জেলগেট থেকে পুনরায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ঐসব মামলায় গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে। সম্প্রতি এমন একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে রিমান্ড চাওয়া হয় এবং বলা হয় যে, তিনি গত ১৩ নভেম্বর আরামবাগে নটরডেম কলেজের কাছে সদলবলে গিয়ে যাত্রীবাহী বাসের উপর হামলা করেছেন, ভাঙচুর করেছেন এবং নিজ হাতে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন।

আদালতে পুলিশ অফিসারের এই বক্তব্য সরকারি উকিলরাও জোরালোভাবে সমর্থন করায় এই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জনাব খানের আইনজীবীরা আদালতে দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করে অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং জানান যে, বর্ণিত সময়ে জনাব রফিকুল ইসলাম খান গ্রেফতার অবস্থায় জেল কাস্টোডিতেই ছিলেন। অর্থাৎ অভিযোগটি পুরোপুরিভাবে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পুলিশ কর্মকর্তার আনীত অভিযোগ যে মিথ্যা তা আদালতেই প্রতিপন্ন হয়েছে। আদালত এ প্রেক্ষিতে রিমান্ড আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, একজন রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণভঅবে মিথ্যা ও প্রতিহিংসামূলক একটি

www.pathagar.com

অভিযোগ এনে তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে রিমান্ড চাওয়া ও তা সমর্থন করার জন্য আদালত সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ও আইনজীবীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। দেশের প্রচলিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী এটা তাদের প্রাপ্য ছিল, তারা আদালতের পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত করেছেন। তাদের শাস্তি না দেয়ায় আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়েও জনমনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কিভাবে সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্ধ করে দেয় এবং তাদের বিবেক-বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তার আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখলাম অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলায়। এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ তার নাগরিকত্বের বিরোধিতা করে আদালতে নিছেন পেশ করে বলেছিল যে অধ্যাপক গোলাম আযম মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগিতায় দেশে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির ন্যায় মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। এর প্রমাণ হিসেবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু রিপোর্ট এবং জেনারেল ইয়াহিয়া ও জেনারেল টিক্কা খানের সাথে তার সাক্ষাতের একটি ছবি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। বিচারপতি ইসমাইল উদ্দিন সরকার তার রায়ের ২৪-২৫ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে তার মন্তব্য ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন এভাবে,

"The petitioner (Prof. Golam Azam) also challenged the authenticity of some of the events mentioned in the subsequent publications. Except some news item and one photograph showing that the petitioner met General Tikka Khan or General Yahya Khan there is nothing to directly implicate the petitioner in any of the atrocities alleged to have been perpetrated by the Pakistan Army or their associates, the Rajakars, Al Badrs or the Al Shams... We do not find anything that the petitioner was in any way directly involved in perpetrating the alleged atrocities during the war of independence." বিজ্ঞ বিচারপতির মন্তব্য ও বিশ্লেষণ এখানে অত্যন্ত পরিষ্কার। রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক তার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনীর সহযোগিতায় সংঘটিত নির্যাতনের স্বপক্ষে পেশকৃত দলিল দস্তাবেজ ও সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রেক্ষাপটে মাননীয় আদালতের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, যুদ্ধপরবর্তী

www.pathagar.com

প্রকাশনাসমূহে উল্লেখিত কতিপয় ঘটনার সত্যতা ও যথার্থতাকে আবেদনকারী (অর্থাৎ অ্যাপক গোলাম আযম) চ্যালেঞ্জ করেছেন। জেনারেল টিক্কা খান অথবা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাতের ছবি ও কতিপয় নিউজ আইটেম ছাড়া আবেদনকারী অধ্যাপক গোলাম আজমকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তার সহযোগী রাজাকার, আল বদর, আল শামস-এর কথিত নির্যাতনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করা যায় না। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ছাড়া কোনওভাবে সরাসরি জুলুম-নির্যাতন ও বর্বরোচিত কোন কাজে জড়িত ছিলেন এমন কিছু আমরা পাইনি (অনুচ্ছেদ নং ১২৬)।

বলাবাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধকালীন কোনও অপরাধের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করতে রাষ্ট্রপক্ষ ব্যর্থ হয় তখন এটর্নি জেনারেল পুনরায় তার স্বাধীনতা পরবর্তী আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং বলেন যে, হাইকোর্ট ডিভিশনে তিনি পর্যাপ্ত কাগজপত্র দাখিল করতে পারেননি। আদালতের অনুমতি নিয়ে তিনি অধ্যাপক আবু সায়িদ লিখিত একটি পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান যে, অধ্যাপক গোলাম আযম হজ্বের পরে (১৯৭২-৭৩) একটি রাজনৈতিক সামরিক মিশন নিয়ে সউদী আরব সফর করেছেন এবং সউদী সরকার ও লিবীয় সরকারকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। তার অভিযোগের সমর্থনে এটর্নি জেনারেল জামায়াত কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তকও আদালতে পেশ করেন। পুস্তকটি অধ্যয়ন করে দেখা যায় যে অধ্যাপক গোলাম আযম বিভিন্ন মুসলিম দেশ সফর করেছেন এবং নবসৃষ্ট বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য মুসলিম দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই পুস্তকের বর্ণনা অনুযায়ী বাংলাদেশকে সহযোগিতার লক্ষ্যে তিনি এমনকি রাবিতা-ই-আলমে ইসলামীর মাধ্যমে এসব দেশ থেকে আর্থিক সাহায্যও সংগ্রহ করেছেন। এই অবস্থায় বিজ্ঞ আদালত এটর্নি জেনারেলের অভিযোগকে গালগল্পভিত্তিক অভিহিত করে (hearsay) পেশকৃত প্রমাণপত্র প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন পাঠকরাই বলুন, আওয়ামী লীগের অভিযোগ আইন ও সততার ধোপে টিকে কিনা। আওয়ামী লীগ করলে আইনজীবী হোক আর রাজনীতিবিদ সম্ভবত. ফ্যাসিবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা তাদের উম্মাদ করে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে তোলে। কেউ কেউ বলে তাদের মাথার বুদ্ধি হাঁটুতে নেমে আসে। রফিকুল ইসলাম খান ও অধ্যাপক গোলাম আযমের মামলায় তারা তার প্রমাণ

www.pathagar.com

দিয়েছেন। যুদ্ধাপরাধের মামলাসমূহেও তারা উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে সেই প্রমাণ দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সরকারের হাতে যুদ্ধাপরাধের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে, মন্ত্রী মিনিস্টারদের এই ধরনের ঘোষণার প্রেক্ষাপটে জামায়াতের পাঁচ জন শীর্ষ নেতাকে ছয় মাস আগে গ্রেফতার করা হয়। অদ্যাবধি তাদের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটররা সুনির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ তৈরি করতে পারেননি। ইতোমধ্যে তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের নামে প্রহসনও হয়েছে। কথিত অকূস্থল থেকে ৭/৮ মাইল দূরের বাসিন্দা দলীয় কর্মীদের এনে তদন্ত দলের সামনে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। এমন লোক সাক্ষ্য দিয়েছেন যারা ঘটনার সময় শিশু ছিলেন। সরকারদলীয় নেতাকর্মী ও সন্ত্রাসীদের নিয়ে প্রসিকিউটর সাহেবরা তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছেন, তা জয় করেছেন, মিডিয়ার সামনে তা তুলে ধরেছেন। এলাকার নিরপেক্ষ লোকদের কাছে ঘেঁষতে দেননি। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়েছে ট্রায়ালটা ট্রাইব্যুনাল আদালতের নয়, রাস্তায় বা মিডিয়াতে হবে। অভিযুক্তদের পক্ষে আইনজীবীদের কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না। সত্য কথা বললে আইনজীবীরাও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার শিকার হচ্ছেন। অভিযুক্ত রাজনীতিক, আলেম-উলামা তাদের আত্মীয়-স্বজন, আইনজীবী সবাই এখন সরকারি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। দেশ-বিদেশের সাথে তাদের যোগাযোগ করতে দেয়া হচ্ছে না। গোয়েন্দারা তাদের অনুসরণ ও হয়রানি করছে। আইনমন্ত্রী বলেছেন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ দেশে তারা পাচ্ছে না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের আর্কাইভ থেকে সেগুলো সরকার জোগাড় করার চেষ্টা করছেন। তার এই তথ্যটি অদ্ভুত। অপরাধ ঘটেছে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আর তার প্রমাণ রয়েছে এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকা আমেরিকার বিভিন্ন দেশের আর্কাইভে। মাথা খারাপ হয়ে যায়নি এ ধরনের কেউ কি একথা বিশ্বাস করতে পারেন? যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল হয়েছে। মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ নেতারা যেভাবে বিচার নিয়ে, বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে এবং অভিযুক্ত ও সম্ভাব্য অভিযুক্তদের নিয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন তাতে এই ট্রাইব্যুনালের প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। মামলা দিয়েও সরকার আশ্বস্ত হতে পারছেন বলে মনে হয়। রাজধানীর দেয়ালে দেয়ালে অভিযুক্ত নেতাদের চরিত্র হননের লক্ষ্যে যে কসরত পরিলক্ষিত হচ্ছে কোনও সভ্য

www.pathagar.com

দেশে তা দেখা যায় না। বিচার যদি রাস্তায় আর মিডিয়ায় করতে হয় তাহলে আদালতের প্রয়োজন কি? আবার বিচার বিভাগ সম্পর্কে টিআইবি যে জরিপ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা দেখার পর বিবেকসম্পন্ন যে কেউই এখন বলতে বাধ্য হবে যে, এই দেশে এই সরকারের আমলে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত বিচার পাওয়া সম্ভব নয়। ইনসাফ ও আদালতের পরিবেশ এখানে অনুপস্থিত। কাজেই যুদ্ধাপরাধের মামলাগুলো জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক কোনও বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমার মনে হচ্ছে সরকার যে পথে যাচ্ছে, স্বখাত সলিলেই তাদের ডুবতে হবে। আওয়ামী লীগের মল আওয়ামী লীগই পরিষ্কার করবে। দুনিয়াকে ধোঁকা দেয়ার কাজ বেশি দিন চলতে পারে না।

শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করেছিলেন। এ জন্য ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তিস্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যকারিতা সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকা গত ২৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমার সময় যুক্তরাষ্ট্রের আইনজীবী নিরেনবার্গের পরামর্শ নিয়েছিলেন শীর্ষক একটি নিবন্ধ ছেপেছে, এই নিবন্ধে কি পরিস্থিতিতে এবং কোন দর্শনের ভিত্তিতে শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা বিধৃত করা হয়েছে। ক্ষমাও বিচারের একটা অংশ। শেখ মুজিবের কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার মরহুম পিতা প্রজ্ঞার ও দূরদর্শিতাকে অস্বীকার করে মূল যুদ্ধাপরাধীদের পরিবর্তে তার এ দেশীয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে পিতার আমলে প্রণীত আইনে বিচার শুরু করেছেন। তার প্রজ্ঞার প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু বিচার কয়বার হয়। তার শাসনামলের দু'বছরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। দালাল আইনে এদেশে কাদের কাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের তালিকা অদ্যাবধি তারা তৈরি করতে পারেননি। যাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই কখনো থানায় আসেনি ৪০ বছর পর মরা হাড়গোড় দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন ও সাক্ষ্য প্রমাণ যোগাতে প্রাণান্ত চেষ্টা চলছে। এতে যেমন স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতিমালা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ লঙ্ঘিত হচ্ছে তেমনি জনমনে ক্ষোভ বিক্ষোভও দানা বেঁধে উঠছে। হত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারি দল ও তার অঙ্গ সংগঠনের

www.pathagar.com

নেতাকর্মীরা প্রতিদিনই যেখানে মানবতাবিরোধী অপরাধের পাহাড় সৃষ্টি করে চলেছে সেখানে ৪০ বছর আগের মানবতাবিরোধী অপরাধের বানোয়াট অভিযোগে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিচারের নামে প্রহসন ক্ষমতাসীনদের দেউলিয়াপনাই শুধু নয়, আধিপত্যবাদী শক্তির ছত্রছায়ায় ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের নির্লজ্জ অনুশীলন বলেই মনে হয়।

যুদ্ধাপরাধ আইনে স্বচ্ছ বিচারের বিশ্বস্বীকৃত মানদণ্ডের অনুপস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে মার্কিন সিনেটর জজ বুজম্যান সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীকে একটা চিঠি লিখেছেন। চিঠিটির বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য আওয়ামী ঘরানার পত্রিকাগুলো সম্ভবত লজ্জায় তা ছাপেনি। এর আগে আন্তর্জাতিক বার এসোসিয়েশনসহ বিশ্বের খ্যাতনামা আইনজ্ঞ এবং যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন ১৯৭৩ এর বিভিন্ন ত্রুটি ও অমানবিক ধারার উল্লেখ করে সংশোধনীর সুস্পষ্ট সুপারিশ পেশ করেছিলেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি দেশের প্রতিনিধি ড. স্টিফান ফোয়েন প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, "The trial must meet the international standards and due process must be ensured where an accused has the right to defend and appeel. It should be an open trial and observers have access to it. Some journalists from Europe would come to see and report the trial proceedings." এর অর্থ সোজা। বিচারের আন্তর্জাতিক মান বজায় না থাকলে এই বিচার ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। বিচার প্রক্রিয়ায় অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থন ও আপিলের সুবিধা থাকতে হবে। এই বিচার হতে হবে উন্মুক্ত এবং তাতে পর্যবেক্ষকদের উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। ইউরোপের কিছু সাংবাদিক ও বিচার প্রক্রিয়া দেখার ও রিপোর্ট করার জন্য এতে উপস্থিত থাকবেন। তার প্রস্তাবকে আমি চমৎকার প্রস্তাব বলে মনে করি। সরকার এক্ষেত্রে যে জট সৃষ্টি করেছেন তা তাদেরই এখন খুলে দিতে হবে।

- দৈনিক সংগ্রাম, ২৮ ডিসেম্বর ২০১০

www.pathagar.com

কাদ নাজালা ইয়াজুজু ওয়া মাজুজু ফি বাংলাদেশ

– ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন

মধ্যপ্রাচ্যসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি বাজারে গত কয়েক বছর ধরে যে ধস পরিলক্ষিত হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধানে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের মন্ত্রী-সচিবরাও বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন এবং তারা সংশ্লিষ্ট সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর কাছ থেকে বাজার খুলে দেয়ার মৌখিক প্রতিশ্রুতি পেলেও কার্যত এসব সফরের ফলাফল শূন্য। কোন কোন সমীক্ষক বলেছেন যে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে মন্দার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রভাব সর্বত্র পড়েছে এবং এর ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের চাকরিদাতা সরকারি ও বেসরকারি এজেন্সিগুলো তাদের কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে এবং এর পরিণতি হিসেবে এসব দেশে বাংলাদেশী শ্রমিক নিয়োগ হয় বন্ধ হয়ে গেছে নতুবা সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বিদ্যমান শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছে। আবার কোন কোন সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারি উদ্যোগের অভাব, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে আমাদের দূতাবাসমূহের নিষ্ক্রিয়তা, তাদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষার অভাব, জনশক্তির চাহিদা নিরূপণ ও তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের রফতানিকারক এজেন্সিগুলোকে তা পূরণের ব্যাপারে সহযোগিতা না করার দরুনই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এসব সমীক্ষায় আবার এও বলা হয়েছে যে, জনশক্তি রফতানির বাজার দেখাশোনার মুখ্য দায়িত্ব সরকারের হলেও এতোদিন যাবত বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো ঐ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বেসরকারি এজেন্সিগুলোর ওপর অলিখিত বেশ কিছু বিধি

www.pathagar.com

নিষেধ আরোপিত হয়। তারা কার্যত স্বাধীনভাবে কাজ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেন। অনেকে চাঁদাবাজির শিকার হন। এতে করে বিদেশী নিয়োগদাতাদের কাছ থেকে জনশক্তির চাহিদা সংগ্রহ ও তার ভিত্তিতে তা সরবরাহের ব্যাপারে তারা অনেকটা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। আবার পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের বৃহত্তম জনশক্তি রফতানি বাজার সৌদি আরবের রাজ পরিবারের একজন সদস্য রূপালী ব্যাংক ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি অগ্রীম অর্থও পরিশোধ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সরকার কোনরকম কারণ প্রদর্শন ছাড়াই বিলম্বের অজুহাত তুলে একতরফাভাবে এই চুক্তি বাতিল করে দেন। ফলে সৌদি সরকার ক্ষুব্ধ হন। এর ফলে তারা সৌদি আরবে বাংলাদেশী জনশক্তি আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এই কারণগুলোর কোনটি সত্য, কোনটি অসত্য তা যাচাই করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা সত্য যে, মধ্যপ্রাচ্য দূরপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশসমূহে বাংলাদেশের জনশক্তি রফতানি আগের তুলনায় প্রায় এক চতুর্থাংশে নেমে এসেছে। এসব দেশে নতুন জনশক্তি নিয়োগ যেমন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে তেমনি পুরাতন কর্মজীবীদের ছাঁটাই-এর পরিমাণও ব্যাপকভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা নতুন করে নিয়োগ চুক্তি নবায়ন করতে পারছেন না কিংবা নিয়োগদাতা পরিবর্তন করতেও পারছেন না। ফলে হাজার হাজার প্রবাসী দেশে ফিরে আসছে। এতে জাতীয় অর্থনীতি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি সামাজিক শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হবারও যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে। তবে সমীক্ষা ও জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম দেশগুলোর সাম্প্রতিক একটি সাধারণ উপলব্ধি। একজন ব্যাংকার সম্প্রতি এক সেমিনারে বক্তব্যদানকালে এই গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধিটির কথাটি জানিয়েছেন। বলাবাহুল্য, প্রতিভাবান এই কর্মকর্তা একটি সেক্যুলার ব্যাংকে কর্মরত আছেন এবং গত বছর হজ্ব করতে গিয়ে মক্কা মদিনায় প্রায় একশ'টি দেশের হাজীদের সাথে কথা বলেছিলেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা বর্ণনা করতে গিয়ে তাকে তারা যে কথাটি বলেছেন তা হচ্ছে, "কাদ নাজালা ইয়াজুজু ওয়া মাজুজ ফি বাংলাদেশ" অর্থাৎ বাংলাদেশে ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব ঘটেছে। সারাবিশ্বের মুসলমানদের কাছে ইয়াজুজু মাজুজু একটি পরিচিত নাম, একটি অত্যাচারী সম্প্রদায়। লুটপাট, খুন-খারাবী ও চরম অশান্তি সৃষ্টি এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পবিত্র কুরআনে সূরা আল কাহাফ-এ

www.pathagar.com

এদের কথা উল্লেখ রয়েছে। এখন কথা হচ্ছে মুসলিম দেশগুলো কেন মনে করে যে বাংলাদেশে ইয়াজুজু মাজুজের আবির্ভাব ঘটেছে? প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তাদের এই ধারণা থেকেই মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং তার প্রভাব আমাদের জনশক্তি রফতানিসহ সামগ্রিক সম্পর্কের ওপর পড়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বে এই নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টির পেছনে মুখ্যত দু'টি ঘটনা দায়ী বলে জানা যায়। এর একটি হচ্ছে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে পুরানা পল্টনে একটি ইসলামী রাজনৈতিক দল কর্তৃক আয়োজিত সমাবেশে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের হামলা এবং প্রকাশ্য রাজপথে সাপের মতো পিটিয়ে মানুষ হত্যা ও নিহত ব্যক্তিদের লাশের ওপর উল্লাস নৃত্য প্রদর্শন। দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে গত বছর নাটোরের বড়াই গ্রামে একই কায়দায় বিএনপি দলীয় উপজেলা চেয়ারম্যান সানাউল্লাহ নূর বাবুকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হত্যা। এই উভয় ঘটনা দেশি-বিদেশী টিভি চ্যানেলসমূহের বদৌলতে সারাবিশ্বের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে এবং মর্মাহত হয়েছে। ঘটনাগুলো ছিল পাশবিক ও নৃশংস। যাদের মধ্যে মানুষের সামান্য রক্তও আছে তাদের জন্য অসহনীয়। যুদ্ধে মানুষ হতাহত হয়। গুলীতে মানুষের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়। পিটিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা এবং উল্লসিত হয়ে লাশের ওপর নাচার ঘটনা দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল। যারাই এই ঘটনাগুলো দেখেছেন তাদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জেগেছে, বাংলাদেশের মানুষ কি আদিম যুগে ফিরে গেছে? তাদের এই নৃশংসতার মধ্যে মুসলিম বিশ্ব ইয়াজুজ মাজুজের বৈশিষ্ট্যকেই প্রত্যক্ষ করেছে এবং দেশটি সম্পর্কে তাদের মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২০০৭ সালের ১১ জানুযারি বাংলাদেশে সেনাসমর্থিত কেয়ারটেকার সরকার এসেছিল এবং তারা তাদের দু'বছরের শাসনামলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নামে আমাদের সকল মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং গণপ্রশাসনের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন এনেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ঘোষিত মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে একটি প্রতিবেশি দেশের সাথে আঁতাত করে তাদেরই দ্বারা নিন্দিত একটি অপশক্তিকে ক্ষমতাসীন করেছে। এই অপশক্তিটি ২৮ অক্টোবরের হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত ছিল। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে হত্যা

www.pathagar.com

মামলায় চার্জশীটও দিয়েছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতায় এসে প্রথম যে কাজটি করেছেন তা হচ্ছে লগি-বৈঠা নিয়ে সংঘর্ষে নামার হুকুমদাতাসহ চার্জশীটভুক্ত সকল খুনের আসামির মামলা প্রত্যাহার এবং তাদের নির্দোষ ঘোষণা। তাদের এই সিদ্ধান্ত দেশে খুনি, সন্ত্রাসীদের নতুন জীবন প্রদান করে এবং পুলিশ ও দলীয় সন্ত্রাসীদের সহায়তায় তারা নতুন নতুন হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। তাদের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, খুন, রাহাজানি, গুম প্রভৃতি নতুন মাত্রা পায় এবং রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষ করে ইসলামপন্থীদের নির্মূল করার অশুভ অভিযানে তারা নেমে পড়ে। টুপি-দাঁড়িওয়ালা, নামাযী, ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের প্রধান টার্গেট হয়ে পড়ে। আলেম-উলামা এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হয় এবং তাদের ধ্বংস করার জন্য তারা স্বাধীনতার ৪০ বছর পর যুদ্ধাপরাধের ধুয়া তুলে বিচারের নামে প্রহসনের নাকট মঞ্চস্থ করতে শুরু করে। এ দেশের বুক থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ও অনুশাসনকে মুছে ফেলাই যে তাদের মূল লক্ষ্য তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে উচ্ছেদ করে তার স্থলে ধর্ম নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করার মধ্যদিয়ে। তারা এই সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকেও বিসমিল্লাকে বাদ দেয়ার অশুভ প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন এবং শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে কুরআন ও সুন্নাহকে শুধু অবজ্ঞাই করছেন না বরং সরকারি সংস্থা ইসলামিক ফাউন্ডেশনে প্রশিক্ষণের নামে মসজিদের ইমামদের ডেকে এনে কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল ব্যালে নৃত্য প্রদর্শন করেছেন যাতে মার্কিন ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে। এদেশের মানুষেরা চিন্তা-চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মসূচির নামে ক্ষমতাসীনরা ইহুদী-মুশরিক সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে তারা বিদেশ থেকে সুন্দরী নর্তকী ও গায়ক-গায়িকাদের আমদানি করে অনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং চরিত্র বিধ্বংসী উচ্ছৃঙ্খলতা ছড়াচ্ছে। প্রতিবাদমুখর আলেম সমাজের উপর তারা হামলা-মামলা ও নির্যাতনও শুরু করেছে। আদালতের মাধ্যমে বোরকার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তারা মুসলিম মেয়েদের ফরজ দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি করেছে এবং কুরআনে বিধৃত সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন করে নারীনীতি প্রণয়ন করেছে। তাদের ইসলামবিরোধী অপতৎপরতা সারাদেশের ১৫ কোটি মুসলমানকে বিক্ষুব্ধ করে তুললেও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ

www.pathagar.com

প্রদর্শনের মৌলিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, শিরকপন্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং মসজিদের ইমাম ও খতিবদের অনুষ্ঠানে নগ্ন ব্যালে নৃত্য প্রদর্শনের জন্য দেশের খ্যাতনামা আলেম ওয়ালামারা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যে ডিজির অপরসারণের জন্য আন্দোলন করছেন হাইকোর্টকর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়াবিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে করা আপীলের নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় সেই মহাপরিচালকের কাছেই মহামান্য আপীল আদালত মতামত প্রদানের জন্য পাঁচজন আলেমের তালিকা চেয়েছেন। আগেই বলেছি, বিতর্কিত মহাপরিচালক জনাব শামীম আফজাল ইতোমধ্যে তার ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য হক্কানী আলেম-ওলামা এবং বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে নিন্দিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। এই আলেম-ওলামারাই হাইকোর্টের ফতোয়াবিরোধী রায়ের বিরুদ্ধে গত কয়েক বছর ধরেই আন্দোলন করছেন। এই অবস্থায় মহাপরিচালক শামীম আফজাল আপীল আদালতে ফতোয়া সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য হক্কানী কোন আলেমের তালিকা পেশ করবেন এটা অনেকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। আদালতের নির্দেশ কিভাবে প্রতিপালিত হয় তা এখন দেখার বিষয়।

আমি বিদেশে বাংলাদেশের ইমেজ ধ্বংসকারী কয়েকটি হত্যাযজ্ঞের কথা উল্লেখ করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে কুখ্যাত ২৮ অক্টোবরের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ মামলার আসামীদের সরকার মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অর্থাৎ সারা দুনিয়ার মানুষ যে হত্যাযজ্ঞ দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন সে হত্যাযজ্ঞ ক্ষমতাসীনদের কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি। মানুষ হত্যার এ অপরাধ সরকারের দৃষ্টিতে কোন অপরাধই ছিল না এবং পরোক্ষভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনসমূহের সদস্য হলে তারা যত অপরাধই করুক না কেন তা সব বৈধ। তাদের সামনে আইনের শাসন মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। অত্যাচার অবিচারের এর চেয়েও বড় দৃষ্টান্ত কি দুনিয়ায় আছে? এই হত্যাকাণ্ডের পর তারা আরও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, জাহাঙ্গীরনগর এবং শাহজাহাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠসমূহে কোথাও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের মাধ্যমে, আবার কোথাও প্রতিপক্ষের ওপর হামলা করে এ যাবত

www.pathagar.com

তারা শিক্ষাপতিষ্ঠানসমূহে পাঁচ শতাধিক হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু কোন বিচার হয়নি। অন্যান্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। অন্যান্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড তো আছেই। নাটোরের বড়াইগ্রামের উপজেলা চেয়ারম্যান সানাউল্লাহ নূর বাবু হত্যার সাথে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সম্পৃক্ততার ভিডিও ফুটেজ ও সচিত্র রিপোর্ট যথাক্রমে টিভি চ্যানেলসমূহ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সরকার দলীয় নেতাদের চাপে প্রথমদিকে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে পত্রপত্রিকাসমূহ সমালোচনামুখর হয়ে পড়ায় এদের ১৯ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ মামলাটির ভাগ্য ২৮ অক্টোবরের মামলার মতোই হবে। আসামীদের ইতোমধ্যে জামিন দেযা হয়েছে- যদিও জামিনের ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য এরই মধ্যে উচ্চ আদালতের তরফ থেকে রুলিং দেয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের বিদ্যমান অবস্থার আলোকে দেখা যায় যে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ড তো দূরের কথা অন্য যেকোন ফৌজদারী অপরাধের ব্যাপারে বিরোধী দলসমূহের নেতাকর্মীদের দূরতম যদি কোন সংশ্লেষও পাওয়া যায় অথবা ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে এ ধরনের সামান্যতম সন্দেহও যদি পুলিশের মনে সৃষ্টি হয় তাহলে তাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে এবং আদালত তাদের জামিন দিচ্ছে না। অধ্যাপক মুজিবুর রহমানসহ জামায়াতের কয়েকজন নেতাকর্মী একটি দোয়ার মাহফিলে শামিল হচ্ছিলেন। এই অবস্থায় তাদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্র পরিকল্পনার অভিযোগ আনা হয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আদালত তাদের জামিন দেননি। পরবর্তীকালে জামিন দেয়া হলেও জেলগেট থেকেই অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং বলা হয় যে, সরকারের বিরুদ্ধে ঐ দিন মিরপুরের একটি বাড়িতে ষড়যন্ত্র করছিলেন। যিনি মুক্তি পেয়ে জেলগেট থেকেই বাড়িতে পৌঁছতে পারলেন না তিনি সরাসরি কিভাবে অন্য এটি স্থানে গিয়ে সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। দেশবাসী এ প্রশ্নের উত্তর এখনও খুঁজে পায়নি। প্রায় একই রকমের অবস্থা হয়েছে ঢাকা মহানগরীর আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলামের ব্যাপারেও। তাকে গ্রেফতার করে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়,

www.pathagar.com

দীর্ঘকাল আটক রাখার পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে তাকে মুক্তি দিয়ে জেলগেট থেকেই পুনরায় নতুন আকেরটি মামলায় গ্রেফতার করা হয়। এ মামলায় একটি নির্ধারিত তারিখ ও মাস উল্লেখ করে বলা হয় যে, ঐদিন তিনি হরতালের সমর্থনে নটরডেম কলেজের সামনে পিকেটিং এর নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং নিজ হাতে বাস ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছেন। কিন্তু জেলখানার ও আদালতের রেকর্ডপত্রে দেখা গেছে যে, ঐদিন জনাব রফিকুল ইসলাম মুক্ত মানুষ ছিলেন না। জেলখানাতেই বন্দি ছিলেন। বিষয়টি আদালতের গোচরীভূত করা হয়েছিল, কিন্তু মিথ্যা রিপোর্ট দেয়ার জন্য আদালত সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেননি এবং তাকে মুক্তিও দেননি। বিচারের বাণীকেও এখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে এ ধরনের অবিচার, নির্যাতন, অমানবিক আচরণ, অত্যাচার, নিপীড়ন, নিষ্ঠুরতা, লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞ প্রতিদিনই ঘটছে। পত্রপত্রিকা ও টিভি চ্যানেলসমূহে এর খণ্ডিত চিত্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। এই অবস্থায় মুসলিমবিশ্ব এই অত্যাচারীদের মধ্যে যদি ইয়াজুজ মাজুজের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পায় তাহলে কিছু করার আছে কি? তাদের এই অনুভূতি থেকেই এই দেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বিদেশীদের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। তারা বাংলাদেশী বলতেই খুনি-সন্ত্রাসী বুঝছেন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশীরা তেল সমৃদ্ধ দেশসমূহ ও উন্নয়নশীল এবং উন্নত মুসলিম দেশসমূহে চাকরির অযোগ্য বিবেচিত হচ্ছে তেমনি বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগও তাদের আকর্ষণ হারাচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন দেশের মানুষকেই নিশ্চিত করতে হবে।

- দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ মার্চ ২০১১

www.pathagar.com

সরকারের অগ্রাধিকার পরিবর্তন ও প্রধানমন্ত্রীর দেশপ্রেম তত্ত্ব

– ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন

একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই। নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ডাক্তারী ওষুধে খুব একটা বিশ্বাস করতেন না। ডাক্তারদের আশ্বাসের উপরও তার আস্থা ছিল না। এ ব্যাপারে তার একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে। তিনি বলেছেন, Medicine is a collection of uncertain prescriptions, the results of which taken collectively, are more fatal than useful to mankind. Water, air and cleanliness are the chief articles in my Pharmacopoeia.

অর্থাৎ ওষুধ হচ্ছে সন্দেহজনক ব্যবস্থাপত্রের একটি স্তূপ, যার সবগুলো পরিণাম একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা মানবজাতির কল্যাণের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। আমার ওষুধ তৈরির গ্রন্থ তথা ফার্মাক্রোপিয়ার প্রধান উপকরণ হচ্ছে পানি, বাতাস এবং পরিচ্ছন্নতা।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ধর্মান্ধ কোনও ব্যক্তি ছিলেন না। মানুষকে সুস্থ ও জীবিত রাখার ক্ষমতাও তার ছিল না। কিন্তু তথাপিও আমি এমন অনেক লোককে দেখেছি যারা নেপোলিয়ানের দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন এবং এদের কেউ কেউ ৮০ বছরেরও বেশি জীবিত ছিলেন।

পাঠকদের কেউ কেউ হয়ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত "What Doctor Won't Tell you" শীর্ষক একটি মাসিক নিউজ লেটার পড়ে থাকবেন। ম্যাকটেগার্ট নামক একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর সম্পাদনা

www.pathagar.com

করতেন। বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে তিনি স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং পুরস্কার পেয়েছেন, একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে সিনেট সাব কমিটিতে সাক্ষ্য দিতে এসে তিনি অনেক অজানা তথ্য দিয়েছেন যার সাথে ডাক্তারদের অনেকেই একমত হননি। কেউ কেউ আবার তা শুনে মুখও লুকিয়েছেন। তিনি ডাক্তারদের না বলা তথ্যের একটি ফর্দ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন যে চিকিৎসা পদ্ধতির আংশিক একটি তালিকা রয়েছে যা আদৌ কাজ করে না, হয়ত সাময়িক উপশম দিতে পাবে। যেমন ক্যান্সারের জন্য কেমো থেরাপী, সার্ভিক্যাল ক্যান্সারের প্রাথমিক ডিটেকশনের জন্য প্যাপ স্মীয়ার টেস্ট, হার্ট বাইপাস সার্জারী, গর্ভস্থ সন্তানের আল্টা সাউন্ড স্ক্রীনিং, স্তন ক্যান্সার নিরাময়ে রেডিশন মাষ্টেকৃমী, কোলেস্টরেল কমানোর ওষুধ, প্রোস্টেট টিউমারের জন্য রেডিয়েশান বা সার্জারী, হরমোন প্রতিস্থাপনে থেরাপী এবং হৃদনালীর ব্লক সারানোর জন্য এনজিও প্লাস্টি প্রভৃতি। ডা. ম্যাকটেগার্ট তার ৭৭ বছর বয়স্ক শ্বাশুড়ির উদাহরণ টেনে বলেছেন যে তার ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়েছিল এবং পারিবারিক চিকিৎসক বদলিয়ে তার নিউজ লেটারের প্যানেনিস্ট ডা. প্যাটক কিংসলিকে তার দেখা শোনার ভার দেন, ডা. কিংসলি রোগীর খাবার ও পথ্যের উপর কড়াকড়ি আরোপ করেন, ভিটামিন সি ও অন্যান্য এন্টি অক্সিডেন্ট জাতীয় ওষুধের ডোজ বাড়িয়ে দেন এবং হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ইন্ট্রাভেনাস ডোজও প্রয়োগ করেন। ডা. কিংসলি অভিমত দেন যে তার ব্যবস্থাপত্রে রোগের প্রশমন হবে। তবে রোগী যদি তার পুরাতন খাদ্যাভাসে ফিরে যায় তাহলে রোগও ফিরে আসবে। যে ডাক্তার তাকে তিন মাসের হায়াত দিয়েছিলেন তিনি যে ছোট ডাক্তার ছিলেন তা নয়, তিনিও সব জানতেন কিন্তু বলতেন না, এই রোগী আরো দশ বছর বেঁচে ছিলেন। ডাক্তারদের সমস্যা হচ্ছে তাদের অনেকটাই নাকি রোগীকে প্রকৃত অবস্থা জানান না, রোগী ধরে রাখার জন্য আশ্বাস দিতেও ভুলেন না। আমাদের দেশে খ্যাতিমান ডাক্তারদের অনেকেই দৈনিক ৫০ থেকে ১৫০ জন রোগী দেখেন। কাউকে আধা মিনিট কাউকে ১ মিনিট আবার ভাগ্যবানরা দেড় দু'মিনিট সময়ও পান। আমি একবার তীব্র জন্ডিস আক্রান্ত ছেলেকে দেখানোর জন্য বাংলাদেশের প্রতিথযশা একজন লিভার বিশেষজ্ঞের এপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিলাম। নির্ধারিত সময়েরর ছয় ঘণ্টা পর

www.pathagar.com

তিনি সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন এবং রোগী দেখেছিলেন দেড় মিনিট। তিনি কোনও ওষুধ দেননি। তার ল্যাব এ ১৪ হাজার টাকার প্যাথলজিক্যাল টেস্টের প্রেসক্রিপশন দিয়ে রোগীকে তার ক্লিনিকে ভর্তি করানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি এর কোনটিই করিনি কমদামী ডাক্তারের চিকিৎসায় ছেলে আরোগ্য লাভ করেছিল। এখন আমি কোনও বড় ডাক্তারের কাছে যাই না, কাউকে যেতেও বলি না। কারণ তাদের বেশির ভাগ পয়সাকে বেশি চেনেন রোগীর আরোগ্য তাদের ইনকাম কমে যায়। তাদের উপর আমার ন্যায় অনেকেরই আস্থা নেই। এতো গেল ডাক্তারদের কথা। পলিটিসিয়ানদের অবস্থা কি আমাদের দেশে তাদের চেয়ে ভাল? পলিটিসিয়ান ও পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর কেউ কেউ রাখ ঢাক না করেই এখন মানুষের সাথে প্রতারণা করে। সর্বসহিষ্ণু এদেশের মানুষ বার বার প্রতারিত হয় তাদের বিশ্বাস করে।

সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন মহাজোট সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কয়েকটি কাজের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছয়টি কাজের মধ্যে ৫টি হচ্ছে বিচার সংক্রান্ত এবং একটি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর সংক্রান্ত কাজ। বিচার তালিকায় পাঁচটি কাজের মধ্যে রয়েছে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, দশ ট্রাক অস্ত্র খালাসের মামলা, চারদলীয় জোট সরকারের দুর্নীতির বিচার, যুদ্ধাপরাধের বিচার এবং বিডিআর হত্যাযজ্ঞের বিচার প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য আওয়ামী লীগ বিগত নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষিত তাদের নির্বাচনী ইশেতেহারে ক্ষমতায় গেলে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিক পাঁচটি কাজ নির্ধারণ করেছিল। এই কাজগুলোর মধ্যে প্রথমটি ছিল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলায় সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং খাদ্যসামগ্রীসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য কমিয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা। এই উদ্দেশ্যে চাঁদাবাজি মওজুদ দারী ও মুনাফাখোরী সিন্ডিকেটসমূহ ভাঙ্গারও তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষা ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুমুখী অভিযান পরিচালিত হবে।

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে সরকারে এসে তারা এই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ১০ টাকা মূল্যে প্রতি কেজি চাল ও

www.pathagar.com

বিনামূল্যে সার দেয়ার তার ঘোষণা বেমালুম ভুলে গিয়ে এখন অস্বীকার করেছেন। ইউরিয়া সারের মূল্য এজলাফে ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছেন। দুঃসহনীয় দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত প্রায়। সরকারের দ্বিতীয় অগ্রাধিকার ছিল বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন এবং ২০১১ সালের মধ্যে দেশকে লোডশেডিং মুক্ত করা, নতুন নতুন ক্ষেত্রে তেল গ্যাস উত্তোলন বৃদ্ধি এবং দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ। গ্যাস নেটওয়ার্কের অধীন এলাকাসমূহেও গ্যাস এবং এলপিজির সরবরাহ বৃদ্ধিরও এতে প্রতিশ্রুতি ছিল। বলা হয়েছিল যে জাতীয় স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রেখে কয়লানীতি চূড়ান্ত করা হবে, কয়লার অর্থনৈতিক উত্তোলনও ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। অগ্রাধিকার তালিকার এই প্রতিশ্রুতিগুলোও সরকার বাস্তবায়ন করতে পারেননি। দেশ যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই আছে। গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে পুরাতন শিল্প কারখানাসমূহের উৎপাদন মারাত্মক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, লোডশেডিং নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাউজিং সেক্টরের হাজার হাজার ফ্লাট বাড়ি হস্তান্তরিত হচ্ছে না। এর প্রভাব পড়েছে বাড়ি ভাড়া ও ব্যাংকঋণের ওপর। ভাড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঋণ খেলাপী হচ্ছে।

দুর্নীতি দমনে ফলপ্রসূ ব্যবস্থাগ্রহণ ছিল মহাজোট সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার অন্যতম প্রধান কাজ। ইশতেহারে বলা হয়েছিল, দলটি ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে। ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের প্রত্যেককেই প্রতিবছর সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে হবে। ঘুষ, রিসওয়াত, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতি দমনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি স্তরে অনার্জিত ও কালো টাকার মালিক, ঋণখেলাপী, টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ এবং পেশীশক্তিধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ করা হবে। জনগণের অধিকার রক্ষায় প্রত্যেকটি বিভাগে নাগরিক সনদের প্রবর্তন করা হবে এবং দুর্নীতির সকল সুযোগ ও রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হবে। দুর্ভাগ্যবশত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের এই অঙ্গীকারটি বাস্তবায়নের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে রাজনৈতিক কারণের অজুহাত তুলে প্রধানমন্ত্রীসহ দলের সকল স্তরের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির দায়ে

www.pathagar.com

আনীত সকল মামলা প্রত্যাহার এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার শুধু বহাল নয় নতুন মামলায়ও তাদের সম্পৃক্তকরণ। দলটির প্রথম সরকারের ন্যায় দেশটিকে তারা বর্তমানে পুনরায় একটি লুটপাট সমিতিতেও রূপান্তর করেছে। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, শ্রমিকলীগসহ মূলদল ও তার অংগ সংগঠনসমূহের নেতাকর্মীদের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, ভর্তিবাণিজ্য, নিয়োগবাণিজ্য, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য গোটা দেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। শেয়ারবাজারের কারসাজি ও কেলেঙ্কারি ৩৫ লাখ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে পথে বসিয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকার আইন করে দুর্নীতি ও অনিয়মকে দায়মুক্তি দিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকারের বশংবদ গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। ফলে দুর্নীতির পরিসর ও ব্যাপ্তি হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে জনপ্রশাসন, বিচারবিভাগ, পুলিশ প্রশাসনসহ সকল রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন আর আমাদের গর্ব করার কিছুই নেই। অনুরূপভাবে সরকারের সুশাসন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের অগ্রাধিকারমূলক কর্মকাণ্ড ও শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনকে দল ও রাজনীতি মুক্তকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ সরকার সকল স্তরে আওয়ামীকরণ নিশ্চিত করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সাংবিধানিক সংকট। পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল এবং কেয়ারটেকার ব্যবস্থাকে বেআইনী ঘোষণা করে প্রদত্ত উচ্চ আদালতের রায় এই সংকটকে আরো ঘনীভূত করেছে এবং সরকারের সামগ্রিক ব্যর্থতা দেশব্যাপী সরকারবিরোধী বিক্ষোভ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। পুলিশ, র‍্যাব, ভ্রাম্যমাণ আদালতের তৎপরতা ও দলীয় কর্মীদের নির্যাতন এবং জেল-জুলুম সত্ত্বেও বিগত ছত্রিশ ঘণ্টার লাগাতার হরতালের সাফল্য সরকারের শীর্ষ মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে বলে মনে হয়। এ প্রেক্ষিতে ব্যর্থতা ও অযোগ্যতা চাপা দেয়া এবং ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে সরকার তার নতুন অগ্রাধিকার স্থির করেছেন বলে মনে হয়। সরকার আশা করছেন যে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যদি বিরোধী দলসমূহের নেতৃত্বকে পঙ্গু করে দেয়া যায় তাহলে সরকারবিরোধী আন্দোলন মাঠে মারা যাবে। বিএনপি-জামায়াত মুখ খুবড়ে পড়বে এবং আগামী নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনে করতে পারলে আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় আসবে।

www.pathagar.com

এরশাদের জাতীয় পার্টি প্রধান বিরোধী দল হবার জন্য দাঁড়িয়েই আছে। নিজেদের সমস্ত মামলা তুলে নিয়ে বিরোধী দলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা নতুন পুরাতন মামলার বিচারে তাদের কোনও লাজ-লজ্জা নেই। বেগম জিয়াকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের ধারণা তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এখন যদি তার সামনেই সেনা সমর্থিত কেয়ারটেকার আমলে পঙ্গু করা তার দু'ছেলেকে জেলে দেয়া যায় তাহলে পুত্রশোকে তিনি হয়ত রাজনীতিই ছেড়ে দেবেন। তার নিজের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তো আছেই। বিএনপি'র সিনিয়র ও মাঝারি পর্যায়ের অন্যান্য নেতাদেরও যদি বিচারের আওতায় এনে কারান্তরালে পাঠানো যায় তাহলে আন্দোলন সংগঠনের সব শক্তিই দলটি হারিয়ে ফেলবে।

সরকারের সামনে দ্বিতীয় সমস্যা জামায়াত। এই দলটির নেতাকর্মীদের তারা কেনা-বেচার ঊর্ধ্বে বলে মনে করেন। দুর্নীতির অভিযোগে তাদের বিচার করা কঠিন। তাই হিলারীর সাথে প্রধানমন্ত্রীর কথোপকথন অনুযায়ী প্রতিবেশী একটি দেশের নির্দেশনা অনুযায়ী জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে ৪০ বছর আগের বানোয়াট যুদ্ধাপরাধের মামলা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এই নেতাদের সাথেই তারা ঐক্যবদ্ধ ও যুগপৎভাবে টানা ৬ বছর এরশাদের স্বৈরাচার বিরোধী এবং বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে চারবছর আন্দোলন করেছেন। হরতাল অবরোধ করেছেন এবং যৌথভাবে প্রেসব্রিফিং করেছেন। তখন তারা যুদ্ধাপরাধী ছিলেন না। এখন যখনি তাদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলছেন তখনি তারা যুদ্ধাপরাধী হয়ে গেছেন এবং সকল রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও লাজলজ্জার মাথা খেয়ে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ এনে তাদের বিচারের সম্মুখীন করছেন। উদ্দেশ্য একটাই, জামায়াত সরকার বিরোধী আন্দোলন সংগঠনের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলবে। সংবিধান থেকে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' উঠিয়ে দিয়ে তারা এখন প্রতিবেশী দেশের উপর ভরসা করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে প্রদেয় সকল সুযোগ সুবিধাই এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দেয়া হচ্ছে এবং দেশবাসী যাতে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে না পারে তার জন্য বিরোধী দলের উপর দলন নিপীড়ন শুরু করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এখন অন্য প্রসঙ্গে আসি। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন যে, তার বিশ্বাস, তার চেয়ে বড় দেশপ্রেমিক আর কেউ নেই। একটি মার্কিন কোম্পানির সাথে ৮০:২০ অনুপাতে উৎপাদন ভাগাভাগি চুক্তির প্রেক্ষাপটে তেল, গ্যাস ও বন্দর রক্ষা কমিটির বিক্ষোভ ও বিরোধী দলগুলোর প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে তিনি এই মন্তব্য করেছেন বলে মনে হয়। একই দিন পত্র-পত্রিকায় আরো একটি খবর বেরিয়েছে যে, এ মাসের প্রথম সপ্তাহে পদুয়া সীমান্তের ১২৭০ নং মেইন পিলার থেকে ১২৭১ এর ৭ এস পিলার পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তিনটি স্থানে খুঁটি বসিয়ে প্রায় ৩৫০ একর বাংলাদেশি ভূমি ভারতকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে? বলাবাহুল্য আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সরকারের আমলে দীর্ঘদিন ভারতের দখলে থাকা পদুয়া গ্রামটি বিডিআর দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু আজকের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে (তিনি তখনো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) ভারতকে গ্রামটি ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সিলেটে আরো তিন একর জমি ভারতকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে সম্ভবত কেউ যাতে মনে না করেন যে, প্রধানমন্ত্রীর দেশপ্রেম নেই, সেজন্য প্রধানমন্ত্রী তার দেশপ্রেমের কথা বলে থাকবেন। তবে এতে অন্যদের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ আছে বলে মনে হয়। অবশ্য আমরা যারা বার বার দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিয়েছি তারা মনে করি না যে, আমাদের দেশপ্রেম কারোর চেয়ে কম। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ ডিসেম্বর এই সময়টা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের জন্য মহাসংকটকাল। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রদেশব্যাপী যে অসহযোগ, হরতাল, অবরোধ, অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং অবাঙ্গালি জনপদের উপর যে অত্যাচার-অবিচার শুরু হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান আর্মির নির্মম ক্র্যাকডাউন সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনে এনে দিয়েছিল অমানিশার অন্ধকার। তাদের জান, মাল ও ইজ্জতের কোনও নিরাপত্তা ছিল না। যখন তখন গ্রেফতার, পাশবিক ও দৈহিক অত্যাচার এবং নির্যাতন পরিণত হয়েছিল নিত্যদিনের ভাগ্যলিপি। এই সময়টি ছিল দেশপ্রেমিকদের পরীক্ষা দেয়ার প্রকৃষ্ট সময়। সীমান্তপারে ভারত ভূখন্ডে আশ্রয়প্রার্থী ৭৫.৫৬ লাখ শরণার্থী ব্যতীত বাকি ৭ কোটি বাঙালি ছিল কার্যত সশস্ত্র হিংস্র পাক বাহিনীর হাতে বন্দী। এরা পাক বাহিনীর জুলুম সহ্য করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের আহার, আশ্রয় এবং অন্যান্য

www.pathagar.com

সহযোগিতা দিয়েছে। তারা আত্মত্যাগ করেছে, স্বজন হারিয়েছে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। ভারতপন্থী দলগুলো ছাড়া অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীরা তাদের সাহস জুগিয়েছে, পাক বাহিনীর হাত থেকে তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। পক্ষান্তরে ভারতপন্থী দলগুলোর নেতা-নেত্রীরা দেশবাসীকে তোপের মুখে ঠেলে দিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সাথে সে দেশে প্রাণভয়ে শরণার্থী হয়েছিল ৭৫.৫৬ লাখ লোক, সাম্প্রদায়িক বিভাজন অনুযায়ী যাদের মধ্যে ছিল ৬৯.৭১ লাখ হিন্দু, ৫.৪১ লাখ মুসলমান এবং ০.৪৪ লাখ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোক। প্রবীণ রাজনীতিবিদ জাতীয় লীগ প্রধান অলি আহাদের ভাষায়, "ভাগ্যের কি পরিহাস, ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এদেশের মৃত্যুঞ্জয়ী সাত কোটি মানুষ মুহূর্তের মধ্যে ভারতের আশ্রয়প্রার্থী শরাণার্থীদের দৃষ্টিতে পাকবাহিনীর সহযোগী রূপে অভিযুক্ত হয় এবং এক পলকে পরিণত হয় এক অচ্ছ্যুৎ শ্রেণিতে। আরো পরিতাপের বিষয় ১৬ ডিসেম্বরের পরে অনুষ্ঠিত অত্যাচার, অবিচার, লুটপাট, খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ-নির্যাতন ১৬ ডিসেম্বরের আগেকার মতই সমভাবে শহর, নগর, গ্রামের বাঙালি জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। ভারত প্রত্যাগত মুষ্টিমেয় শরণার্থী ছিল এর জন্য দায়ী।" দেশপ্রেমের দলীয়করণ এক্ষেত্রে তৎকালীন ক্ষতাসীন দলকে ভারসাম্যহীন করে তোলে এবং তারা সারা জাতিকে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ এই দুটি শক্তিতে বিভক্ত করে নেয়। আওয়ামী লীগ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরোধিতা এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারকেও রাজাকারে পরিণত করে- (যেমন মেজর জলিল) দেশপ্রেম একটি বিশেষ দলের পৈত্রিক সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ভারতে অবস্থানকালে স্বাধীনতাযুদ্ধে সহযোগিতার বিনিময়ে ভারত সরকারের সাথে সাতটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই চুক্তিগুলোর বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপঃ

১) ভারতীয় সমরবিদদের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে আধা সামরিক বাহিনী গঠন করা হবে। গুরুত্বের দিক থেকে এবং অস্ত্র-শস্ত্র এবং সংখ্যায় এই বাহিনী মূল সামরিক বাহিনী থেকে বড় এবং তাৎপর্যপূর্ণ হবে (যেমন, রক্ষী বাহিনী)।

২) ভারত থেকে সমরোপকরণ এবং অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করতে হবে এবং ভারতীয় সমরবিদদের পরামর্শের ভিত্তিতে তা করতে হবে।

www.pathagar.com

৩) ভারতীয় পরামর্শেই বাংলাদেশের বহিঃবাণিজ্য কর্মসূচি নির্ধারণ করতে হবে।

৪) ভারতীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের বাৎসরিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৫) বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ভারতীয় পরাষ্ট্রনীতির অনুরূপ হবে।

৬) ভারতের সম্মতি ছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত কোনও চুক্তি বাতিল করা যাবে না।

৭) ডিসেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ভারত যে কোনও সময় যে কোন সংখ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে বাধাদানকারী শক্তিকে চুরমার করে দেয়ার অধিকার তার থাকবে।

উপরোক্ত চুক্তিগুলো প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ স্বাক্ষর করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই সাতটি চুক্তি ঈষৎ পরিমার্জিত রূপে ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ ঢাকার বুকে বঙ্গভবনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত ২৫ সালা 'বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও শান্তি' চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। দেশের সকল রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করেছিল। তৎকালীন সরকার দেশের স্বার্থের পরিপন্থী ও জাতিদ্রোহী অবস্থান থেকে এক চুলও নড়তে রাজী ছিল না এবং চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে পার্লামেন্টের বা বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণেরও প্রয়োজন বোধ করেনি। ২০১০ সালে জানুয়ারি মাসে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয় এবং পার্লামেন্টেও তা পেশ করা হয়নি।

ভারতকে মরণ বাঁধ ফারাক্কা চালুর অনুমতি প্রদান ছিল তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের ঘৃণ্যতম কাজগুলোর অন্যতম। এই বাঁধ চালু করার ফলে বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবার ঝুঁকিতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহারের ফলে পদ্মা ও তার অববাহিকা অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়, গাছ-পালার পুষ্টি উপাদানে সংকট দেখা দেয় এবং আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব

www.pathagar.com

বিপদ সীমা অতিক্রম করে। লোনা পানির প্রাদুর্ভাবও বেড়ে যায় এবং এর ফলে উপমহাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট মিল খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলসহ বাংলাদেশের হাজার হাজার শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে যায়। শীত মওসুমে পদ্মার হার্ডিঞ্জ ও গোদাগাড়ি পয়েন্টে এখন লঞ্চ, স্টীমারের পরিবর্তে গরুর গাড়ি চলে। নদী এখন চর। এছাড়াও ১৯৭৪ সালের ১৬ মে মুজিব-ইন্দিরার মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুযায়ী তৎকালীন সরকার বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বেরুবাড়ী ভারতের কাছে হস্তান্তর করে। কিন্তু তার পরিবর্তে তিন বিঘা করিডোরসহ বাংলাদেশের পাওনা ছিট মহলগুলোতে অদ্যাবধি আমাদের দখল ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিজ ভুখন্ড বিদেশের হাতে তুলে দেয়া স্বাধীন একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা বিসর্জন, তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দান দেশ প্রেমের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা তা অবশ্য প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি মনে করি কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর দেশপ্রেমে খাদ থাকতে পারে না। এই অবস্থায় আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি দেশপ্রেমের মানদণ্ড ঠিক করে দেন তাহলে আমরা সকলেই উপকৃত হতে পারি।

- দৈনিক সংগ্রাম, ২১ জুন ২০১১

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের জামায়াত বিদ্বেষ : কিছু কারণ ও বিশ্লেষণ

– ড. মুহাম্মদ নূরুল আমিন

গত মঙ্গলবার এই স্তম্ভে প্রকাশিত নিবন্ধে আমি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জামায়াত বিদ্বেষের কারণ অনুসন্ধান ও তা বিশ্লেষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। নিবন্ধটি পড়ে একজন সাবেক সচিব ও আমার এককালের সিনিয়র সহকর্মী গত বুধবার রাতে টেলিফোনে আমাকে একটি চমকপ্রদ খবর দিয়েছেন। খবরটি শুনে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর জামায়াত বিএনপির গন্ধ আছে এ রকম শত শত সরকারি কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত অথবা ওএসডি করেছেন একথা সবারই জানা। কিন্তু এই গন্ধের তীব্রতা সম্পর্কে আমার খুব বেশি ধারণা ছিল না। আমার প্রবীণ সহকর্মী সেটাই আমাকে জানিয়েছেন। তিনি একজন ওএসডি যুগ্মসচিবের কথা বললেন যার পিতৃকূল, মাতৃকূল কোন কুলেই জামায়াত-বিএনপি ছিল না, এখনো নেই, তিনি নিজেও কোনও দল করেননি, এখনো করেন না। তবে তার মামা শ্বশুরের শালার মেয়ের জামাই ঢাকা মহানগরীর এক ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি। এই অপরাধে তিনি ওএসডি এবং পদোন্নতি বঞ্চিত অবস্থায় আছেন।

ন্যাশনাল সার্ভিস নামে পরিচিত সরকারি অর্থে দলীয় ক্যাডার পোষার একটি কর্মসূচির অধীনে জনবল নিয়োগের মানদণ্ড তৈরির লক্ষ্যে বছর দুয়েক আগে সরকার প্রার্থীদের সম্পর্কে ছয়টি তথ্য সংগ্রহের নির্দেশনা জারি করেছিল।

www.pathagar.com

এই শর্তগুলোর মধ্যে প্রার্থীর বাপ-চাচারা আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত কি না সে সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ছিল। কিন্তু এ সম্পর্ক যে বিদ্যমান সরকারি কর্মকর্তাদের বেলায় প্রয়োগ করা হবে এবং তা গিয়ে মামার শালার মেয়ের জামাই পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে তা কখনো ভাবিনি। ঘটনাটা অমানবিক এবং সভ্যতার সকল নীতিবৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।

এখন আসল কথায় আসি। আওয়ামী লীগের জামায়াত বিদ্বেষকে কেউ যদি স্বাধীনতা-উত্তর ফিনমিনন বলে মনে করেন তাহলে তা সঠিক হবে বলে আমি মনে করি না। এই বিদ্বেষ পাকিস্তান আমলেও ছিল, যদিও তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকেই এক্ষেত্রে একটি স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে চলতেন এবং জাতীয় দুর্যোগ বিশেষ করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে জামায়াতের সাথে তারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনও করেছেন। সম্মিলিত বিরোধীদল (COP), পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (PDM), গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি (DAC) প্রভৃতি জোটে অংশ নিয়ে দেশব্যাপী আওয়ামী লীগ-জামায়াত নেতাকর্মীরা যেমন পাশাপাশি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে কাজ করেছেন তেমনি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রুজু করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও তার মুক্তির আন্দোলনেও জামায়াত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। তবে উগ্র ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্য থেকে আওয়ামী লীগ কখনো নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। ক্ষমতায় থাকুক কিংবা বিরোধীদলে, দলটির অসহিষ্ণু, অগণতান্ত্রিক ও শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ সর্বদা দেশবাসীকে পীড়া দিয়েছে। ১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভায় আওয়ামী লীগের সশস্ত্র হামলা দলটির ফ্যাসিবাদী চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছিল। তখন আওয়ামী লীগাররা জামায়াতকে পাকিস্তানবিরোধী হিসেবে চিত্রিত করতো যেমনটি এখন করা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে।

অনেকে মনে করেন যে, জামায়াত সম্পর্কে অজ্ঞতাই হচ্ছে আওয়ামী লীগসহ অপরাপর কিছু দলের জামায়াত বিদ্বেষ ও জামায়াত বিরোধিতার মূল কারণ। জামায়াত নিছক কোনও রাজনৈতিক দল নয়। এটি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আলোকে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে দুষ্কৃতির অপসারণ ও

www.pathagar.com

সুকৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি মানুষের কল্যাণকামী একটি আন্দোলন। এটি ধর্মান্ধ কোনও দল নয়। আধুনিক মন মানস ও যুগজিজ্ঞাসার আলোকে সর্বশেষ প্রযুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী শরীয়াহ, আকিদা বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও অনুশাসনভিত্তিক, রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা হচ্ছে জামায়াতের ভিশন, মিশন ও গোলের অন্তর্ভুক্ত। এই উদ্দেশ্যে চরিত্রবান ও উপযুক্ত লোক তৈরির উপর এই সংগঠনটি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এজন্য তারা শিক্ষা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ও বিচ্ছুরণের জন্য বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারও গড়ে তুলেছে। কুরআন, হাদিস, ফিকাহ-উছুলের চর্চা শুধু তিলাওয়াত বা সীমিতসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাতে শরিক হবার জন্য তারা সাধারণ মানুষকেও অনুপ্রাণিত করছে। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতির সাথে কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনামূলক অধ্যয়নকে উৎসাহিত করছে।

জামায়াত সাম্প্রদায়িক কোনো দল নয় এবং তথাকথিত মোল্লাতন্ত্রেও বিশ্বাস করে না। জামায়াত গোপন কার্যকলাপে বিশ্বাসী কোন দলও নয়, উন্মুক্ত ময়দানে প্রকাশ্যে শুরু থেকেই তার কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কিংবা জঙ্গিবাদকে বরাবরই ঘৃণা করে আসছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, আওয়ামী লীগসহ দেশ-বিদেশে কিছু দল আছে যারা জামায়াতের ঘোষিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচিকে অধ্যয়ন না করে তার ওপর তাদেরই মনগড়া সন্ত্রাসবাদ চাপিয়ে দিতে চান। তারা মনে করেন যে, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে চুরির জন্য হাত কাটা আইন, জ্বেনা ব্যভিচারের জন্য বেত্রাঘাত, পাথর মেরে হত্যা কিংবা কুকুর লেলিয়ে দেয়ার আইন চালু করবে। ইসলামী আইনকে তারা মধ্যযুগীয় বর্বর আইন বলে মনে করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তাদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি কর্তৃক রেসকোর্স ময়দানে জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে গণআদালতের নাটক মঞ্চস্থ করা ছিল এরই ধারাবাহিকতা। এরপর কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও জামায়াত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করেছে। এই আন্দোলনের ফলে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা সংবিধানেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ২০০১ সালের নির্বাচনে জামায়াত বিএনপির সাথে জোট গঠন করায় পুনরায় দলটির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায় এবং চারদলীয় ঐক্যজোট নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতাসীন হয়। এরপর আওয়ামী লীগ এক্ষেত্রে জামায়াতকে অন্যতম প্রধান শত্রু হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। তার জামায়াত বিদ্বেষ চরমে ওঠে। দলটি পুনরায় ক্ষমতায় আসার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা জামায়াত বিএনপি জোট ভাঙার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে ধ্বংসাত্মক পথে অগ্রসর হয়।

তাদের এই ধ্বংস প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এক এগারোর জন্ম হয় এবং সেনা সমর্থিত কেয়ারটেকার সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এই সরকারের আমলে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান তুঙ্গে ওঠে। শেখ হাসিনা ও বেগম জিয়া গ্রেফতার হন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শীর্ষস্থানীয় বহু নেতা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ইন। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ১৫টি মামলা রুজু হয় এবং তার মধ্যে ৪টি মামলার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পথে ছিল। এই দলে সাধারণ সম্পাদকসহ শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অনেকেই রিমান্ডে যে জবানবন্দী দিয়েছেন তাতে স্পষ্টতই দলটির দেউলিয়াপনা ফুটে উঠে এবং প্রতীয়মান হয় যে, শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে তাদের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ও ঘুষ দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এতে তাদের দেশী-বিদেশী সুহৃদরা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন।

বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের কিছু রাজনীতিবিদ ও থিঙ্কট্যাংক সদস্য এই মর্মে উস্কানি দিতে শুরু করেন যে, সেনাসমর্থিত কেয়ারটেকার সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে সামনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতাদের পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না তারা নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষিত হবেন এবং জামায়াত সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হয়ে বাংলাদেশে সরকার গঠন করবে। তারা জামায়াতকে ভারতবিরোধী একটি দল হিসেবে আখ্যায়িত করে তার অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার উপর জোর দেন। ঐ সময় ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ভাস্কর রায়, কার্লেসকর এবং 'র' এর বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের লিখিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও প্রতিবেদনসমূহ পড়লে এটাই পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, জামায়াতই

www.pathagar.com

হচ্ছে তাদের চোখে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা এবং তারা ভারত বিরোধী- যদিও এর মধ্যে সত্যতার লেশমাত্র নেই। আওয়ামী লীগ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই জামায়াতকে দেখে থাকে এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ীই 'পথে কাটা' সরানোর অংশ হিসেবে জামায়াত বিরোধী অভিযান শুরু করেছে। এর পেছনে আরো কারণ হচ্ছে, উইকিলিকস-এর তথ্যানুযায়ী দলটি ভারতীয় অর্থ, আশীর্বাদ ও পরামর্শের উপর ভর করে ক্ষমতায় এসেছে। এর বিনিময়ে তারা ভারতকে ট্রানজিট, করিডোর, বন্দর ও গ্যাস সুবিধা প্রদান করার চুক্তি করেছে। এর বিরুদ্ধে জামায়াত-বিএনপি যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনমত গঠন করে চুক্তির বাস্তবায়ন নস্যাৎ করতে না পারে সে জন্য স্বাধনিতার ৪০ বছর পর যুদ্ধাপরাধের মিথ্যা অভিযোগ এনে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে বিচারের প্রহসন চালাচ্ছে এবং সারাদেশে জামায়াত-শিবিরের উপর নির্যাতন শুরু করেছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জামায়াত এবং বিএনপি ঐক্যবদ্ধ থাকলে যে শক্তির সৃষ্টি হবে তার রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার ক্ষমতা সরকারের নেই। কিন্তু জামায়াত ছাড়া বিএনপির অস্তিত্ব নাই বলে সরকারের অর্বাচীন কিছু মন্ত্রী হাল আমলে যেসব কথা বলছেন, তার সাথে বাস্তবতার কোনও সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। বিএনপি জামায়াতের কারণে শক্তিশালী একথা সত্য নয়। আবার জামায়াতকে স্তব্ধ করতে পারলে বিএনপি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এ তত্ত্বে যারা বিশ্বাস করেন, তারা বোকার স্বর্গে বাস করেন। বিএনপি একটি জাতীয়তাবাদী ধারা। এই ধারার মূলশক্তি দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। ইসলামী ধারা যুক্ত হয়ে একে শক্তিশালী করেছে সন্দেহ নেই। এদেশের মানুষের আধিপত্যবাদ বিরোধী চিন্তা-চেতনা এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অঙ্গীকার ও শ্রদ্ধা এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ঈমান-আকীদা ও বিশ্বাস যতদিন থাকবে ততদিন এই ধারাকে বিলুপ্ত করা যাবে না।

জামায়াত শিবির নেতাকর্মীদের উপর যে নির্যাতন শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় তা আমি জানি না। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের পূর্বে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের উপর এ ধরনের নির্যাতন হয়েছিল। তবে তার ব্যাপ্তি এত প্রসারিত ছিল না। সরকার মনে করছেন, জামায়াতকে

www.pathagar.com

ঠেকিয়ে ইসলামকে ঠেকাতে পারবেন এবং প্রতিবেশী দেশের ইচ্ছা ও আশীর্বাদের ভিত্তিতে অনন্তকাল ক্ষমতায় থাকতে পারবেন। কিন্তু কোনও দলকে বেআইনী করে কিংবা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে তার নেতৃত্বকে ধ্বংস করে যে দলের আদর্শ ধ্বংস করা যায় না ইতিহাসই তার সাক্ষী। এক দল বেআইনী হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আধুনিক রাজনীতিতে অন্য দল জন্ম নেয় এবং আদর্শ শুধু টিকে থাকে না তা আরো শক্তিশালী হয়। সরকারি দল যত শীঘ্রই বিষয়টি উপলব্ধি করবেন ততই মঙ্গল।

- দৈনিক সংগ্রাম, ১১ অক্টোবর ২০১১

www.pathagar.com

সন্ত্রাস জিহাদ এবং প্রপাগাণ্ডার লক্ষ্য-উপলক্ষ

– আবুল আসাদ

মানবতাবাদী ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টির জন্যই ইসলামকে, ইসলামের পবিত্র জিহাদকে সন্ত্রাসের সাথে এক করে দেখার সুপরিকল্পিত প্রয়াস চলছে গোটা দুনিয়াজুড়ে। সেই সাথে গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোকেও সন্ত্রাসী সাজাবার মতো জঘন্য মিথ্যাচার চালানো হচ্ছে একই লক্ষ্যে যাতে মাঠ থেকে ইসলামের বাস্তব উপস্থিতির উচ্ছেদ সম্ভব হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামীও এই নগ্ন মিথ্যাচারের শিকার। এই মিথ্যাচারে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশেরও কিছু পত্র-পত্রিকা, কিছু মানুষ। এদের মিথ্যাচারের পেছনে রয়েছে দৃশ্যত স্থানীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক বিদ্বেষ। কিন্তু পশ্চিমী অনেক মিডিয়া এই মিথ্যাচারে অংশ নেয় কেন? এই প্রশ্নটা উঠেছিল 'CNN-IBN SPECIAL' নামের একটি রিপোর্ট দেখে। 'Eye to eye with terror in Bangladesh' শীর্ষক CNN তৈরি কাহিনীতে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসী চক্রের কেন্দ্র অভিহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামের নামে সন্ত্রাস যারা করেছে, তাদের প্রথম সারির ও উল্লেখযোগ্য প্রায় সবাই যে গ্রেফতার হয়েছিল, শীর্ষ ছয় নেতার ফাঁসি হয়েছিল এবং অন্যদের বিচার চলে, এ বিষয়ে একটি কথাও বলা হয়েছিল না CNN-IBN রিপোর্টে। এই সত্য গোপন করার সাথে সাথে চূড়ান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ইসলামী নামের সংগঠন হরকাতুল জিহাদ ও আফগান ফেরত মুজাহিদদেরকে গণতান্ত্রিক ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামীর অংশ বলে উল্লেখ করা হয়। সাক্ষী হিসেবে শাহরিয়ার কবিরকে হাজির করা হয় রিপোর্টে। মন্দ নয়, চোরের সাক্ষী গাইট কাটা। CNN-

www.pathagar.com

IBN-এর জন্য এই রিপোর্টটি করেন Suman K. Chakrabarti মহাশয়। সুমন বাবু নাকি বাংলাদেশে ব্যাপক সফর করে এই রিপোর্ট করেন। কিন্তু তার রিপোর্ট নামক কাহিনীটি পড়লে ওয়াকিফহাল যে কেউ বলবেন, তিনি সম্ভবত ঢাকাও দেখেননি কিংবা দেখলেও ঢাকাকে বুঝেননি। তার রিপোর্টে বায়তুল মোকাররমের নাম ছিল। কিন্তু বায়তুল মোকাররমের ভুল পরিচয় তিনি লিখেছেন। তিনি বায়তুল মোকাররমকে বলেছেন মাদরাসা এবং এই মাদরাসাকে তিনি চরমপন্থীদের লালনের জন্য অভিযুক্ত করেছেন (Over 2 lackh madrasas are there in Bangladesh, out of which the famous Baitul Mokarram in the heart of capital Dhaka is accused of harbouring radicals). সুমন বাবু যেভাবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমকে মাদরাসা বানান, সেভাবেই তিনি গণতান্ত্রিক দল জামায়াতে ইসলামীকে হরকাতুল জিহাদের সাথে এক করে দেখেন। তিনি যখন মসজিদ ও মাদরাসার পার্থক্য বুঝেন না, তখন তিনি কিভাবে গণতান্ত্রিক দল জামায়াতে ইসলামী ও গোপন সংগঠন হরকাতুল জিহাদের মধ্যকার পার্থক্য বুঝবেন! বুঝবেন না অবশ্যই। এইভাবেই গোটা দুনিয়ায় আজ ইসলামী গণতান্ত্রিক দলকে যারা ইসলামের নাম ব্যবহারী সংগঠন হরকাতুল জিহাদ বা আল-কায়েদার সাথে এক করে ফেলছেন, তারাও CNN-এর সুমন বাবুদের মতই ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝেন না বা সত্য গোপন করেন। না বুঝে বা সত্য গোপন করে তারা জামায়াতে ইসলামীর মতো ইসলামী গণতান্ত্রিক দলকে সন্ত্রাসী হিসেবে তুলে ধরার লক্ষ্যে অলিক কাহিনী রচনা করেছেন। এমন অলিক কাহিনী রচয়িতাদেরই আরেকজন হলেন বাবু হিরন্ময় কারলেকার। তিনি 'Dhaka fails to curb Islamism' শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন।' বাংলাদেশ বিরোধী, ইসলাম বিদ্বেষী এই লোকটি এর আগে 'Bangladesh: The next Afghanistan' নামে একটি বই লিখেছিলেন। সুমন চক্রবর্তীর মতোই এই হিরন্ময় বাবু তার বইতে বাংলাদেশের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের শাহরিয়ার কবির, চরম সাম্প্রদায়িক হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদ, আওয়ামী লীগের একশ্রেণীর রাজনীতিক এবং একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকার অপপ্রচারের ওপর ভিত্তি করেই বাবু হিরন্ময় বইটি লিখেছিলেন। শেষের প্রবন্ধটাতেও তিনি পরের মুখে ঝাল খেয়ে, বিশেষ করে ভারতের বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারকে সম্বল করে বাংলাদেশের তদানীন্তন

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে একহাত নেন। বাংলাদেশের কয়েকটি রেলস্টেশনে বোমা ফাটানো এবং ভারতের মক্কা মসজিদে বোমা হামলার অপরাধে বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের, আরো সবিশেষভাবে ইসলামের কেন গলা টিপে ধরছে না সরকার, এ প্রশ্ন তুলে সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন বাবু হিরন্ময় কারলেকার। হিরন্ময় বাবু যেন দু'চোখে দেখেছেন বাংলাদেশের কেউ গিয়ে ভারতের মক্কা মসজিদে বোমা ফেলে এসেছে। ষড়যন্ত্রকারী প্রপাগাণ্ডিস্টরা গোয়েবলসের মতো এভাবেই সত্যের মতো করে মিথ্যা বলে থাকে। এক্ষেত্রে সুমন চক্রবর্তী, হিরন্ময় বাবু ও CNN-দের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবে হিরন্ময় বাবু ঐ প্রবন্ধে তার মুখোশ খুলে ষড়যন্ত্রকারীর কুৎসিত মুখ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ান। তিনি খোদ ইসলামকেই টার্গেট করেন (তার লেখার শিরোনাম : 'Dhaka fails to curb Islamism' -ইসলামকে দমন করতে ঢাকা ব্যর্থ)। বাবু হিরন্ময় সন্ত্রাস ও ইসলামকে এক করে ফেলে খোদ ইসলামেরই কণ্ঠরোধ করার কথা বলেন। অলিক কাহিনী সাজিয়ে একেই প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসী বলা হয়। সুমন চক্রবর্তী, বাবু হিরন্ময় কারলেকাররা দুনিয়াজুড়ে ইসলাম ও ইসলামের জিহাদের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে আলো এবং কালোকে এইভাবেই এক করে ফেলার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

সোনার পাথর বাটি একটা অলিক কথা। বাটি যদি সোনার হয়, তাহলে একে পাথর-বাটি বলা যায় না। আবার বাটি পাথরের হলে তাকে সোনার বলা যাবে না। ঠিক এই একই অবস্থা জিহাদ ও সন্ত্রাসকে নিয়ে এবং ইসলামী গণতান্ত্রিক দল ও ইসলামের নাম ব্যবহারকারী সন্ত্রাসী সংগঠনকে নিয়ে। ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস কোনোভাবেই, কোনো দিক দিয়েই এক জিনিস নয়। ইসলাম মানবতাবাদী ধর্ম, আর সন্ত্রাস মানব হত্যাকারী একটা কাজ। ইসলাম বিশ্বপালক আল্লাহর অসীম করুণার এক নিয়ামত হিসেবে মানুষের শান্তি কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করতে চায়, অন্যদিকে সন্ত্রাস কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে হত্যা ও ধ্বংসলীলার মাধ্যমে মানুষের শান্তি, স্বাধীনতা হরণ করে থাকে। সুতরাং ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস এই দুইয়ের এক হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে দেখা হয়েছে। ইসলামকে সন্ত্রাস এবং মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হিন্দুদের বাপুজী গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বও বলেছেন, "ইসলাম এমন পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যে, তার চূড়ান্ত শক্তির

www.pathagar.com

উৎস আগেও তরবারী ছিল, এখনও তরবারীই আছে।" গান্ধী অনেক আগে এ কথা বলেছিলেন অজ্ঞতাবশতই। কিন্তু সেই অতীতের চেয়েও সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসের সাথে ইসলামকে সংযুক্ত করার বহুমুখী প্রয়াস আজ ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করেছে। নাইন-ইলেভেনের পর গত ২০০৫ সালের ১৭ই আগস্ট দেশব্যাপী প্রায় ৫শত বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাংলাদেশেও তা ছোবল হানে। বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো বাংলাদেশের উপর আপতিত এই সন্ত্রাসের সাথেও ইসলামকে যুক্ত করা হয়। আজ পৃথিবীকে যে জিনিসটি অশান্ত করে তুলেছে সেটা হলো সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আর এই সন্ত্রাসের উৎস এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধের প্রতিপক্ষ দাঁড় করানো হয়েছে ইসলামকে। এইভাবে সোনার পাথর-বাটি অলিক কল্পনা হলেও প্রচারের জোরে তাকেই সত্য বলা হচ্ছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ একেবারেই সত্য নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরম অজ্ঞতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত দুরভিসন্ধি ইসলামকে বিকৃত করে তুলে ধরার মূলে কাজ করছে। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য সন্ত্রাস কি, ইসলামের জিহাদ কি তা সকলের সামনে আসা দরকার। এর সাথে আজ বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে ঝড় উঠেছে, তার উৎস কি, লক্ষ্য কি এবং বাংলাদেশেও হঠাৎ করে ভয়াবহ যে সন্ত্রাস মাথা তুলে তার মূলে আসলে কি আছে, কি তারা চেয়েছে তাও অন্ধকার থেকে আলোতে বের হয়ে আসা উচিত।

প্রথমেই আসে সন্ত্রাসের কথা। সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদকে ইংরেজিতে বলা হয় 'টেরর' ও 'টেররিজম' (Terrorism)। সন্ত্রাস বা 'টেরর'-এর সর্বসম্মত সংজ্ঞা পাওয়া যাচ্ছে না। আজকের দুনিয়ায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যোদ্ধারা সন্ত্রাসের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় একমত হতে রাজি নয়। রাজি না হওয়ার কারণ যাকে ইচ্ছা তাকে সন্ত্রাসী সাজাবার সুযোগ উন্মুক্ত রাখা। একজন সমীক্ষক লিখেছেন, "United States' reluctance to come up with a working definition for terrorism out of fears that a clear-cut definition would change the fight against terrorism from a political issue into an ethical one .... in its capacity as superpower, America does not need ethical laws restricting its ambition and targets. Rather, it wants to have spacious room for movement and maneu-

www.pathagar.com

vering and as such keeping the definition ambiguous fits perfectly with this strategy" অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের কোনো কার্যকর সংজ্ঞা নির্ধারণে গররাজী কারণ সন্ত্রাসের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের পথে নৈতিক প্রশ্নকে বাধা হিসেবে দাঁড় করাতে পারে। বৃহৎ শক্তি হিসেবে লক্ষ্য অর্জনের পথে নীতি-নৈতিকতার বেড়াজাল তার কাম্য নয়। বরং তার দরকার অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ সংজ্ঞা যাকে তার কৌশলের সাথে যথেচ্ছা ফিট করা যাবে।

কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা সন্ত্রাসের না থাকলেও সন্ত্রাসের সংজ্ঞা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'World Book' encyclopaedia সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছে, "Terrorism is the use of threat of violence to create fear and alarm. Terrorists murder, kidnap people, set off bombs, hijack airplanes, set fires and commit other serious crimes. Common victims of terrorist kidnappings and assassinations include diplomats, business executives, political leaders, judges and police."

অর্থাৎ– সন্ত্রাস হলো ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যে হিংসাত্মক কাজ সংঘটিত করা অথবা এর হুমকি প্রদান করা। সন্ত্রাসীরা হত্যা, অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, বিমান হাইজ্যাক, বোমা হামলা ইত্যাদিসহ মারাত্মক অপরাধের কাজ করে। কূটনীতিক, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা, পুলিশ ও বিচারকরা সন্ত্রাসীদের হত্যা ও অপহরণের শিকার হয়।'

সন্ত্রাসীদের এ কাজগুলোর সবই সাংঘাতিক ধরনের অপরাধ। এই অপরাধগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়। উদ্দেশের দিক দিয়ে সন্ত্রাসীরা বিভিন্ন পরিচয়ের হয়ে থাকে। World Book-এর মতে "লক্ষ্যের দিক থেকে সন্ত্রাসীরা (Terrorists) সাধারণ অপরাধীদের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকে। সন্ত্রাসীরা কেউ কেউ বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের অনুসারী হয়, আবার অনেকে স্বাধীনতাকামী কোনো নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হতে পারে।" সন্ত্রাসের এই উদ্দেশ্যগত পরিচয় থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও তাদের সংগ্রামের একটা পন্থা হিসেবে সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়তে পারে। একে সন্ত্রাস না বলে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামসহ দুনিয়ার সব দেশের সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই ধরনের কর্মকাণ্ডে কমবেশি জড়িত হতে দেখা যায়। কিন্তু আজ অনেকেই সন্ত্রাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যগত পার্থক্যের দিকটা মানতে রাজি নয়। কারণ ফিলিস্তিন, কাশ্মীরের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাহলে টেররিস্ট বলা যাবে না। একটি দেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে রাজনৈতিক বা মতবাদিক কোন গোপন ও সন্ত্রাসী গ্রুপের হত্যা, অপহরণ, বোমাবাজি ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজের যে যোজন পার্থক্য রয়েছে তা একটি পক্ষ আজ মানতে চাচ্ছে না।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগী পাশ্চাত্য দেশগুলো সন্ত্রাসের নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় রাজি না হলেও সন্ত্রাসের ইতিহাসের মধ্যে এর স্বীকৃত সংজ্ঞার সুস্পষ্ট অবয়ব আমরা দেখতে পাই। Terrorism-এর প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ফরাসী বিপ্লবের সময় (১৭৮৯-১৭৯৯)। ক্ষমতা দখলকারী কিছু বিপ্লবীরা তখন তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আচরণের নীতি গ্রহণ করে। এই শাসনকালকে বলা হয় 'Reign of Terror'. এটা ঘটেছিল একটা 'শাসন অথরিটির' অধীনে। কিন্তু 'শাসন-অথরিটি'র বাইরে বেসরকারি পর্যায়ে রাজনৈতিক বা মতবাদিক গ্রুপের দ্বারা সন্ত্রাসের প্রথম যাত্রা শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে ১৮৬৫ সালের গৃহযুদ্ধের পর এবং পুনরায় উনিশ শতকে 'কুক্ল্যাক্স ক্ল্যান' নামক একটা শেতাঙ্গ গ্রুপ কৃষ্ণাঙ্গ ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী সন্ত্রাস চালায়। বিশ শতকের তিরিশের দশকে হিটলার জার্মানিতে, মুসোলিনি ইতালিতে এবং জোসেফ স্টালিন সোভিয়েত ইউনিয়নে বিরোধীপক্ষকে দমনের জন্যে হত্যা-নির্যাতন চালায়। কুক্ল্যাক্স ক্ল্যান ছিল প্রাইভেট গ্রুপ, কিন্তু এসব সন্ত্রাস চলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে বেআইনিভাবে। বিশ শতকের ষাটের দশকে সন্ত্রাসী প্রাইভেট বাহিনী 'রেড ব্রিগেড'-এর উত্থান ঘটে ইতালিতে এবং 'রেড আর্মি' উত্থান ঘটে পশ্চিম জার্মানিতে। এরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাদের ইচ্ছা জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। তবে সবচেয়ে জঘন্য সন্ত্রাস শুরু করে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন বিভক্তির আগে। তাদের লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিন থেকে ফিলিস্তিনীদের তাড়িয়ে দেয়া। নিজেদের স্বাধীনতা ও ভূখণ্ড রক্ষার জন্যে ফিলিস্তিনীরাও তখন বিভিন্ন সশস্ত্র গ্রুপে সংঘবদ্ধ হয় এবং তারা এখনও লড়াই করছে। প্রকৃতপক্ষে এরা নিজেদের আত্মরক্ষাকারী স্বাধীনতা সংগ্রামী। এমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্ভব ঘটে উত্তর আয়ারল্যান্ডে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে (I.R.A-Irish Republican Army)। ঠিক এমনিভাবে সত্তরের দশকে ক্যারিবিয়ান সাগরের পোর্টোরিকোতে FALN নামের স্বাধীনতা সংগ্রামী

www.pathagar.com

গ্রুপের উদ্ভব ঘটে আমেরিকান শাসনের বিরুদ্ধে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য বোমা হামলার ঘটনা ঘটায়।

উপরে সন্ত্রাসের ইতিহাসে আমরা তিনটি গ্রুপের মুখোমুখি হচ্ছি। এক. রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাস যা হিটলার, মুসোলিনী ও স্ট্যালিনদের মধ্যে দেখা গেছে, দুই. আত্মরক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম, যদিও তার সাথে কোন সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও যুক্ত হয় এবং তিন. রাজনৈতিক ও মতবাদিক গ্রুপের বা কোনো ক্রিমিনাল গ্রুপের সন্ত্রাস। পরিচয়ের দিক দিয়ে সন্ত্রাস এখানে তিনভাগে বিভক্ত হলেও অপরাধ বিচারে সন্ত্রাসের এই তিন গ্রুপের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

অন্যদিকে ইসলাম ও ইসলামের জিহাদ এই অপরাধমূলক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়। আকৃতি, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য কোনো দিক থেকেই সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের জিহাদের কোনো মিল নেই।

ইসলামের জিহাদ সামনে আনার আগে ইসলাম মানুষের জীবন ও তার সমাজ-সভ্যতাকে যে দৃষ্টিতে দেখে সেটা জানা দরকার। মানব সভ্যতার ভিত্তি যা আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার সর্বপ্রথম ধারা হলো এই যে, "প্রত্যেক মানুষের প্রাণ ও রক্ত পরম পবিত্র। মানুষের নাগরিক অধিকারসমূহের মধ্যে প্রথম অধিকার বেঁচে থাকার অধিকার, আর অপরাধ থেকে বাঁচতে দেয়া হলো নাগরিক কর্তব্যসমূহের মধ্যে প্রথম কর্তব্য"। আর এটাই ইসলামের প্রথম কথা মানুষের অধিকার সম্পর্কে। এরই বিধান দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কুরআনে। তাঁর বাণী, "..... যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে কোনো গোলযোগ সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কোনো একটি মানুষেরও প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই রক্ষা করলো। ....." আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল কোরআনের আরেক জায়গায় বলেছেন, 'হে মুহাম্মদ, আপনি এইরূপ আহ্বান জানান যে, এসো তোমাদের প্রতিপালক কি কি বস্তু নিষিদ্ধ করেছেন তা জানিয়ে দেই। তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে না। নিজেদের সন্তানদেরকে অভাব-দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করবে না। কেননা তোমাদের জীবিকা যেমন আমিই দিয়ে থাকি, তেমনি ওদের জীবিকাও আমিই দেবো। আর তোমরা অশ্লীলতার ধারে কাছেও যাবে না। মানুষের প্রাণসত্তাকে আল্লাহ সম্মানার্হ্য বলে ঘোষণা করেছেন। সেই প্রাণ

www.pathagar.com

বিনা অধিকারে হনন করবে না। তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্যেই আল্লাহ এসব তোমাদের দিয়েছেন।"

শুধু মানুষের জীবন রক্ষা নয়, মানুষের সহায়-সম্পদ ও সমাজকেও ইসলাম পবিত্র ঘোষণা করেছে। সমাজে, দুনিয়ায় ফেৎনা-ফাসাদ (গোলযোগ) সৃষ্টিকে হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ বলে অভিহিত করেছে আল-কুরআন। ইসলামের লক্ষ্য মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করা। মানুষের ইহকালীন কল্যাণের মধ্যে আইনানুগ, ন্যায়ানুগ সকল শান্তি ও স্বস্তির বিষয় শামিল রয়েছে। শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহর বান্দাহদের জন্যে এমন শান্তির সমাজ কায়েমের জন্যেই দুনিয়ায় এসেছিলেন। সে সমাজ তিনি কায়েমও করেছিলেন। আরবের কাদেসিয়া থেকে সানআ পর্যন্ত একটি মেয়ে একাকী ভ্রমণ করেছে, কেউ তার জান-মাল ও ইজ্জতের ওপর হামলা চালায়নি। অথচ এর ২৫ বছর আগে ইসলাম-পূর্ব যুগে বড় বড় কাফেলাও এই অঞ্চলে নির্ভয়ে চলতে পারতো না। তারপর সভ্য জগতের অর্ধেকেরও বেশি অংশ ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হলো এবং ইসলামের নৈতিক প্রভাব বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন ইসলাম মানব জাতির অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির ন্যায় হিংস্রতা ও নৃশংসতার মূলোৎপাটন করে।

মানব সমাজে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার জন্যেই প্রয়োজন জিহাদের। জিহাদের অর্থ যুদ্ধ মাত্র নয়। মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের যে লক্ষ্য তা অর্জনের জন্যে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো অর্থে জিহাদ শব্দের ব্যবহার। লেখা, কথা-বার্তা ও বিভিন্ন রকম কাজের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনের সকল কর্মপ্রচেষ্টা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ জিহাদের একটা পর্যায় মাত্র। যুদ্ধ যখন আপতিত হয়, জুলুম-নির্যাতনের যখন সয়লাব নামে এবং বিপর্যয় মানুষকে, মানব-সমাজকে যখন গ্রাস করে, তখন অপরিহার্য হিসেবে মানুষকে, সমাজকে বাঁচাবার জন্যে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, "যাদের উপর যুদ্ধ আপতিত হয়েছে, তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা নির্যাতিত। আল্লাহ নিশ্চিতই তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এরা সে লোক, যারা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত হয়েছে। .....আল্লাহ অবশ্যই সে লোকদের সাহায্য করবেন, যারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ....এরা সে সব লোক, তাদেরকে আমরা যদি জমীনে ক্ষমতাদান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং মন্দের নিষেধ করবে।"

www.pathagar.com

যুদ্ধের নির্দেশ দিতে গিয়ে আল-কুরআনের আরেক জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমা লংঘন করোনা। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসে না।...."

যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার উপরোক্ত আয়াতগুলোতে দেখা যাচ্ছে, তিনটি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রথম, আক্রমণের শিকার হওয়া, দ্বিতীয়, নিজ স্থান থেকে বহিষ্কৃত হওয়া, উচ্ছেদ হওয়া এবং তৃতীয়, কারও দ্বারা যদি ফেৎনা-ফাসাদের (সন্ত্রাস-গোলযোগের) সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার এই তিনটি কারণের প্রথম দুইটি আপতিত যুদ্ধকে যুদ্ধ দিয়ে মোকাবিলার নির্দেশ। আর তৃতীয়টি আসলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ। এই তৃতীয় কারণটি বুঝাতে আল-কুরআনে 'ফেৎনা', 'ফাসাদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরানিক পরিভাষা হিসাবে এর অর্থ বিরাট, ব্যাপক। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবেও ফেৎনার অর্থ হলো অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষকে দুঃখ ও অশান্তির আগুনে নিক্ষেপ করা। আর এ দিক থেকে ফাসাদের অর্থ ন্যায়-নীতি ও মধ্যপন্থার পরিপন্থী কাজের মাধ্যমে সামাজিক বিকৃতি ও বিপর্যয় সাধন। সুতরাং 'ফেৎনা'-'ফাসাদ' সমাজে ও মানুষের জীবনে যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে, সেটাই আজকের পরিভাষায় 'সন্ত্রাস'। ইসলামের জিহাদ এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও। সুতরাং ইসলামের জেহাদ সন্ত্রাস নয়, বরং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধের প্রকৃতি ও পরিসীমার দিক থেকে আধুনিক যুদ্ধের সাথে রয়েছে ইসলামের যুদ্ধের যোজন পার্থক্য। হিটলার মুসোলিনীর যুদ্ধ-প্রয়াস ও যুদ্ধকে সন্ত্রাস বলা হয়েছে। এদিক থেকে আধুনিক সব যুদ্ধই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে। ছোট ছোট আন্তঃরাষ্ট্র যুদ্ধ বাদ দিয়ে গ্লোবাল যুদ্ধের কথা যদি ধরি, তাহলেও দেখা যাবে এ যুদ্ধগুলোও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে যায়। ১৪৯৪ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত ৬টি গ্লোবাল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৪৯৪ থেকে ১৫১৬ পর্যন্ত ইতালিয়ান ও ইন্ডিয়ান ওস্যান ওয়ার, ১৫৮০ থেকে ১৬০৯ পর্যন্ত স্প্যানিশ ওয়ারস, ১৬৮৮ থেকে ১৭১৩ পর্যন্ত চতুর্দশ লুই ওয়ারস, ১৭৯২ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত ওয়ারস অব নেপোলিয়ন এবং ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ ও ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দুই বিশ্বযুদ্ধ এর মধ্যে রয়েছে। ফেৎনা, ফাসাদ থেকে মানুষকে মুক্ত করার, সমাজকে রক্ষার মতো কোন মহৎ উদ্দেশ্য এই যুদ্ধগুলোর পেছনে ছিল না। ধ্বংস ও হত্যালীলার মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সীমা বাড়ানো, সম্পদ লুট করা ও মানুষকে দাস বানানোই ছিল এসব যুদ্ধের লক্ষ্য।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসমূলক এসব যুদ্ধে ৮ কোটি ৫৫ লাখ লোক মারা যায়। সাড়ে ৮ কোটি মানুষের এই কুরবানী রাষ্ট্র-সন্ত্রাসের সাম্রাজ্য ও সম্পদের লালসা পূর্ণ করে, আর হরণ করে মানুষের শান্তি ও স্বাধীনতা। ১৯৪৫ সালের পরেও রাষ্ট্র সন্ত্রাসের এই যুদ্ধ এখনও চলছে। ভিয়েতনাম, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, আফগানিস্তান ও ইরাকের লাখ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে এই যুদ্ধে।

প্রকৃতি ও পরিসীমা উভয় দিক দিয়ে এই আধুনিক যুদ্ধ থেকে ইসলামের জিহাদ সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী জিহাদের কোন আগ্রাসী লক্ষ্য থাকে না, ইসলামী জিহাদ থেকে আসা বিজয় মানুষকে দাস বানায় না। ইসলামের জিহাদ যে তিনটি ক্ষেত্রে যুদ্ধের অনুমতি পেয়েছে, এর দুইট আত্মরক্ষা ও আত্মসাহায্যমূলক এবং তৃতীয়টি ফেৎনা-ফাসাদ তথা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধকালীন নীতি ও যুদ্ধ-পরবর্তী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ইসলামের যুদ্ধ আধুনিক যুদ্ধ থেকে আলাদা। ইসলামের যুদ্ধ মানবিক। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তা মানুষকে রক্ষার জন্যেই। খ্রিস্টান বাহিনী যখন জেরুসালেম নগরী দখল করে, তখন তারা ৭০ হাজার নারী-পুরুষকে হত্যা করে। কিন্তু মুসলিম বাহিনী যখন এই নগরীতে প্রবেশ করে তখন একজন নাগরিকও নিহত হয়নি। ইসলামের যুদ্ধ দেশ দখল করে না, সেখানকার মানুষকে মুক্ত করে। তাই তো মুসলমানদের সিরিয়া বিজয়ের পর একজন যাজক তার ইউরোপীয় বন্ধুকে লিখেছিলেন, "এইসব আরব যাদেরকে আল্লাহ এ যুগে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছে, তারা আমাদের প্রভু হয়েছেন। কিন্তু তারা খ্রিস্টধর্মের সাথে আদৌ কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না, বরং তারা আমাদের ধর্ম রক্ষা করে, আমাদের ধর্মযাজক সাধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আমাদের গীর্জা ও মঠে চাঁদা প্রদান করে।" ইসলাম বিজয়োত্তর মুক্ত দেশে ভেতরের কিংবা বাইরের শত্রুর হাত থেকে নাগরিকদের জীবন ও শান্তি-স্বাধীনতা হেফাজতের নির্দেশ দেয়। প্রতিরক্ষার এ দায়িত্ব পালনের জন্যে অমুসলিম নাগরিকদের (যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না) কাছ থেকে প্রতিরক্ষা ট্যাক্স বা যিযিয়া নেয়া হয়। রক্ষার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা ঘটলে ট্যাক্স অর্থ ফেরত দেয়া হয়। তদানীন্তন ইসলামী দুনিয়ার হেমস প্রদেশের মুসলিম শাসক এক অপরিহার্য পরিস্থিতিতে হেমস ত্যাগ করার সময় এই কথা বলে অমুসলিমদের যিযিয়া করের টাকা ফেরত দিয়েছিলেন, "আমরা তোমাদের হেফাজত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। যেহেতু আমরা তা পারছি না, তাই তোমাদের দেয়া ট্যাক্সের উপর আমাদের কোন অধিকার নেই।" এমনকি যুদ্ধকালীন সময়েও মানুষের জীবন শুধু নয়, গাছ-গাছড়া ও মন্দির-গীর্জা

www.pathagar.com

এবং নারী-বৃদ্ধ-নাবালককেও বিশেষভাবে রক্ষার এবং সম্পদ আত্মসাৎ অপহরণ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) তার বাহিনীকে যুদ্ধযাত্রায় বলেন, "অর্থ অপহরণ করো না, তসরুপ করো না, প্রতারণা করো না। শিশুকে কিংবা বয়ঃবৃদ্ধকে কিংবা স্ত্রীলোককে হত্যা করো না। খেজুর গাছ কাটবে না বা দগ্ধ করবে না। কোন ফলের গাছ কাটবে না। গীর্জা ধ্বংস করো না, ফসল পোড়াবে না।" আর দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর যুদ্ধ যাত্রাকালে সেনাবাহিনীর উদ্দেশে বলেন, "যুদ্ধে ভীরুতা প্রদর্শন করো না। তোমার শক্তি থাকলেও কারো অঙ্গচ্ছেদ করো না। বিজয়ী হলে বাড়াবাড়ি করো না। বৃদ্ধ ও নাবালককে হত্যা করো না, যুদ্ধের সময়ও তাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করো।"

ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে এই কিঞ্চিত আলোচনাতেও পরিষ্কার যে, ইসলামের জিহাদ সন্ত্রাস নয়, বরং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইসলামী জিহাদের একটা বড় অংশ। ইসলামের যে জিহাদ যুদ্ধ চলা অবস্থাতেও নারী, শিশু, বৃদ্ধদের হত্যা নিষিদ্ধ করেছে, মন্দির-গীর্জা ধ্বংস করতে নিষেধ করেছে, গাছ-গাছড়া পোড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলছে, এমনকি যুদ্ধের মধ্যেও মানুষের অঙ্গচ্ছেদ সমর্থন করেনি ইসলামের যে জিহাদ, সে জিহাদকে সন্ত্রাস বলা পাগলের প্রলাপ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সে জিহাদের নাম ব্যবহার করা চরম প্রতারণা আর কিছু নয়। কিন্তু এই প্রতারণাই হয়েছে নাইন-ইলেভেনের ঘটনায় এবং এই প্রতারণারই পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার বালি, লন্ডনের সিরিজ বোমা হামলার ঘটনাবলীতে। বাংলাদেশের জেএমবিরা তাদের বোমা সন্ত্রাসের সথে ইসলামের নামে জুড়ে দিয়ে দেশের মানুষের সাথে এই প্রতারণাই করেছে এবং পৃথিবী জুড়ে করেছে ইসলামের বদনাম।

প্রশ্ন হলো, 'সোনার বাটি'কে 'পাথর-বাটি বলার এই অব্যাহত প্রতারণা কেন? সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যার যুদ্ধ, সেই ইসলামকে কেন সন্ত্রাসী সাজানো হচ্ছে, ইসলামের পবিত্র যুদ্ধকে কেন সন্ত্রাস বলা হচ্ছে। অথচ শুধু যুদ্ধ নয়, ইসলাম সব রকম চরমপন্থা পরিহার করতে বলে, সব ক্ষেত্রেই ইসলাম মধ্যমপন্থা অনুসরণ করে। কাজ, কর্ম, মামলা-মুয়ামেলাত সবক্ষেত্রে সুবিচার ও নীতিবোধকে প্রাধান্য দিতে বলে। এমনকি শত্রু কিংবা শত্রু-জাতির ক্ষেত্রেও সুবিচারকেই সিদ্ধান্তের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, "হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনে অবিচল থাকবে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে,

www.pathagar.com

এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।" (আল কোরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত-২) এই একই কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও এক জায়গায় বলছেন, "কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনই সীমালংঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (আল কোরআন, সূরা মায়িদা, আয়াত-৮) এই দুই আয়াতে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কেউ বা কোন জাতি শত্রু হলেও, তার বা তাদের প্রতি বিদ্বেষ-শত্রুতা থাকলেও তার বা তাদের প্রতি অবিচার করা যাবে না, ন্যায়ের সীমালংঘন করা যাবে না। এই যদি হয় অবস্থা যে, শত্রুতা থাকলেও শত্রুর প্রতিও অবিচার করা যাবে না, তাহলে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে কিংবা বোমা মেরে যারা চেনা নয় যারা শত্রু নয়, যাদের প্রতি বিদ্বেষও নেই, শত্রুতা নেই, এমন নারী, পুরুষ, শিশু, বিচারক, উকিল, পথচারীদের হত্যা কি করে সম্ভব? সম্ভব নয়। কোন মুসলমান এটা পারে না। কেউ যদি এটা পারে, তাহলে সে আল্লাহর কোন স্বাধীন বান্দাহ নয়। সে হতে পারে কারও বেতনভুক পুতুল। এদেরকে আল্লাহ সুবিচার বর্জনকারী, সীমালংঘনকারী বলেছেন। এদের জন্যে আল্লাহর কাছে শাস্তি বরাদ্দ আছে। সুতরাং কোনো দিক দিয়েই ইসলামকে, মুসলমানদের সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসের উৎস বলা যেতে পারে না। তাহলে ঘুরে ফিরে সেই প্রশ্ন আবার আসে, ইসলামের পবিত্র জিহাদ যা খোদ সন্ত্রাসেরও বিরুদ্ধে, তাকে সন্ত্রাস, সন্ত্রাসের উৎস বলা হচ্ছে কেন?

এই প্রশ্নের জবাব গ্লোবাল পলিটিক্স এবং আধুনিক বিশ্ব রাজনীতির যুদ্ধ পরিকল্পনার মধ্যে পাওয়া যাবে। আজকের এই বিশ্ব রাজনীতি এক বা একাধিক বিশ্বশক্তির জন্ম দিয়েছে যার 'ওয়ার মেশিন' চালু রাখার জন্যে বিশ্বের সব জায়গায় তাদের উপস্থিতি অপরিহার্য করে তোলার জন্যে এবং বিশ্বের চারদিকে তার প্রভুত্বের ছড়ি ঘুরানোকে যৌক্তিক করার জন্যে সব সময় তার জন্যে একটি ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ দরকার। 'ভয়ঙ্কর' কম্যুনিজম-এর পতন এবং ভয়ংকর প্রতিপক্ষ সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পর আজকের বিশ্ব শক্তির সামনে ভয়ঙ্কর কোন প্রতিপক্ষ থাকে না। এর ফলে তার 'ওয়ার মেশিন' অপ্রয়োজনীয় ও সংকুচিত হয়ে পড়ার উদ্বেগ দেখা দেয় এবং বিশ্বের সব জায়গায় তার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা হুমকির সম্মুখীন হয়। এই

www.pathagar.com

অবস্থার নিরসনের জন্যেই 'ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ' হিসাবে ইসলামকে বাছাই করা হয়। বার্লিন ওয়াল ধসে পড়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বিশ্ব শক্তি থেকে সাধারণ পর্যায়ে যখন নেমে আসে, সেই সময় মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যাকনামারা সিনেটের বাজেট কমিটিতে দেয়া এক অফিসিয়াল বক্তব্যে বলেছিলেন, "U.S. defense spending could safely be cut in half. It became clear the U.S had to either undergo massive shifts in spending, a painful and unwelcome prospect for the defense establishment, or find new justification for continuing high levels of military expenditure." (The war on Islam, Envar Masud) অর্থাৎ মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট এখন খুব সহজেই অর্ধেকে কমিয়ে আনা যায়। এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, এখন হয় মার্কিন প্রতিরক্ষা বাজেট বিপুলভাবে কমিয়ে আনতে হবে যা হবে খুবই বেদনাদায়ক ও অগ্রহণযোগ্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্যে, অন্যথায় আমাদের বিরাট রকম সামরিক ব্যয় অব্যাহত রাখার পক্ষে নতুন যুক্তি দাঁড় করাতে হবে।' এই নতুন যুক্তিই হলো নতুন শত্রু, নতুন প্রতিপক্ষ। তারা নতুন প্রতিপক্ষ খুঁজতে গিয়ে বাছাই করে ইসলামকে। এনভার মাসুদ লিখেছেন, "The magnitude of U.S. defense spending fuels the search for enemies. With the collapse of the Soviet Union, the choice was between the Yellow Peril (East Asia) and the Green Peril (Islam). Islam was chosen." (The war on Islam, Envar Masud, Page-207). অর্থাৎ মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বিশাল বপুর দায়ই তাদেরকে শত্রু খুঁজতে বাধ্য করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দুইটি বিকল্পের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে। একটি হলো 'হলুদ বিপদ' মানে 'পূর্ব এশিয়া' অন্যটি হলো 'সবুজ বিপদ' অর্থাৎ ইসলাম। এই দুই বিপদের মধ্যে ইসলামকেই তারা প্রথম শত্রু হিসেবে বেছে নেয়।

ইসলামকে শত্রু হিসাবে বাছাই এর পর প্রয়োজন দেখা দিল শত্রু হিসেবে তাকে দাঁড় করানোর। শুধু দাঁড় করানো নয়, দাঁড় করাতে হবে শত্রুর ভয়ঙ্কর রকমের ইমেজ দিয়ে। কিন্তু তখন ইসলামের ইমেজে ভয়ঙ্কর কিছু ছিল না। সন্ত্রাসের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে তারা হুমকি হওয়া তো দূরে থাক মানুষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনার বিষয়ও ছিল না। ফিলিস্তিনের

www.pathagar.com

মতো কিছু দেশে সন্ত্রাস বলার মত যেটুকু কাজ ছিল তা ছিল মূলত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অমুসলিমদের দ্বারা যে সন্ত্রাস হতো সেটুকু সন্ত্রাসও মুসলমানদের মধ্যে সেখানে ছিল না। মৌলবাদ বা চরম পন্থা কাউকে শত্রু সাজাবার ইস্যু হতে পারে। কিন্তু এদিক থেকে মুসলমানরা এমনকি খৃস্টানদেরও পেছনে ছিল। বলা হয়েছে, "As for fundamentalism, Islam has no parallel to the U.S. Protestant Christian movement which opposed modern scientific theory. Rather, Islam has, from its birth, stressed the use of reason and logic". অর্থাৎ মৌলবাদিতার দিক থেকে ইসলাম এমনকি প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের মতোও গোঁড়া নয়। মার্কিন খৃস্টান প্রটেস্ট্যান্ট আন্দোলন বিজ্ঞানের তথ্য তত্ত্বের বিরোধিতা করে। অথচ ইসলাম শুরু থেকেই রিজনিং ও লজিকের পক্ষে।

'ভয়ঙ্কর ইমেজ' তৈরির উপকরণ হিসেবেই সম্ভবত এই সময় মুসলিম দেশে কেমিক্যাল ও বায়োলোজিক্যাল উইপনস (CBW) থাকার অভিযোগ উঠে। সুদান হয় প্রথম টার্গেট। তখন পর্যন্ত অবয়বহীন-অজ্ঞাত 'আল-কায়েদা' এবং তার নেতা হিসাবে মার্কিনীদের সহযোগী 'বিন লাদেন'-এর কথা প্রচারিত হয়। অভিযোগ উঠে লাদেনের তত্ত্বাবধানে সুদানের 'আল শিফা' ফ্যাক্টরিতে বায়োলজিক্যাল উইপনস বৈরী হচ্ছে। অভিযোগ তুলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে সে ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে দেয়। এই ধরনেরই অভিযোগ তোলা হয় লিবিয়ার 'তারহুনা' পাম্প স্টেশন সম্পর্কে। বলা হয় ওটা বায়োলজিক্যাল অস্ত্র উৎপাদনক্ষম একটি কেমিক্যাল প্ল্যান্ট। বলা হলো, প্রয়োজন হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে প্ল্যান্ট আণবিক বোমা মেরে ধ্বংস করে দেবে। আসলে ওটা ছিল একটা সেচ প্রকল্প। অনুরূপভাবে প্রমাণ হয় যে, সুদানের আল-শিফা ফ্যাক্টরি নিছকই একটা ওষুধ ফ্যাক্টরি ছিল। New York Times এর বরাত দিয়ে লিখা হয়, "Hours after they launched cruise missile at the factory on August 20, senior national security advisers described Al-Shifa as a secret chemical weapons factory financed by Bin Laden. But now, says the New York Times, State Department and CIA officials argue that the government cannot justify its actions." ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ৮ দিন পর New York Times লিখে

www.pathagar.com

"The plant made both medicine and... drugs according to U.S and European engineers and consultants who helped build, design and supply the plant."

এসব ঘটনা 'ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ' দাঁড় করাতে ব্যর্থ হবার পর নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ঘটে। অকল্পনীয় ও ভয়ঙ্কর এই ঘটনার দায় 'আল-কায়েদা' ও 'লাদেন'-এর উপর চাপানো হয় এবং তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। অথচ আল-কায়েদা ও লাদেনকে না মুসলিম দুনিয়ার কেউ চেনে, না তারা ইসলামের উজ্জীবন আন্দোলনের কেউ। কিন্তু এদেরকেই ইসলাম ও মুসলমানদের সিম্বল হিসেবে সামনে রেখে নাইন-ইলেভেনের ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্যে আকাঙ্ক্ষিত 'ভয়ঙ্কর শত্রু বা প্রতিপক্ষ' রূপে ইসলাম ও মুসলমানদের দাঁড় করানো হয়। শুরু হয় 'War on Terror'.

এবার বাংলাদেশের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে আসা যায়। সুমন চক্রবর্তী বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি বলেন। দেখা যাক এই উক্তির পেছনের ইতিহাস কি। বলা যায়, বাংলাদেশের ১৭ আগস্টের সিরিজ বোমা হামলা এবং তার পরবর্তী আত্মঘাতী ও রক্তাক্ত বোমা হামলার ঘটনাসমূহ নাইন-ইলেভেন ঘটনারই অনুরূপ। নাইন-ইলেভেনের মতই একটা অপরিচিত অদৃশ্য, অজ্ঞাত ইসলামী নামের সংগঠনের দ্বারা এই ঘটনা ঘটানো হয় এবং একইভাবে ইসলামকে খুনি ও বর্বর ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রধান উৎস মাদরাসাকে সন্ত্রাসের ক্ষেত্র হিসাবে অভিহিত করার প্রয়াস চলে। একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা এবং সুমন চক্রবর্তী ও হিরন্ময় বাবুদের মতো বাংলাদেশেরও এক শ্রেণীর মানুষ অব্যাহতভাবে এই অভিযোগ তোলে। অথচ উপরে ইসলামের জিহাদ ও সন্ত্রাস এর আলোচনায় আমরা দেখেছি ইসলামী কোনো সংগঠন এবং ইসলামপন্থী কোন ব্যক্তি বা শক্তিরা এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে না। এই ধরনের ঘটনা তারাই ঘটাতে পারে যারা রাষ্ট্র ও সরকারকে ব্যর্থ করে দেশকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলতে চায়, যারা বিকাশমান গণতন্ত্রকে ব্যর্থ করতে চায়, যারা দেশ ও জনগণের আদর্শিক প্রতিরক্ষা ধ্বংস করার জন্য ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদের খুনি, সন্ত্রাসী হিসেবে দেখাতে চায়। তারাই কিছু অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত ও বেকার কিছু অল্প বয়স্ক ছেলেকে ও বিপথগামী কিছু মানুষকে ইসলামের পোশাক পরিয়ে দেশে একই দিনে একই সময়ে প্রায় ৫ শতাধিক বোমা ফাটায় এবং এরাই দেশের বিচারক ও বিচারালয়ের উপর বোমা হামলা করে। ভারতের আধ্যাত্মিক নেতা মি. গান্ধী

www.pathagar.com

বলেছেন, "The spirit of democracy cannot be established in the midst terrorism, whether governmental or popular'. অর্থাৎ সন্ত্রাসের মাঝে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন, 'The administration of justice is the firmest pillar of the government.' অর্থাৎ– 'বিচার বিভাগই হচ্ছে সরকারের সবচেয়ে সুদৃঢ় স্তম্ভ।' বাংলাদেশে এই গণতন্ত্র এবং এই বিচার বিভাগকেই টার্গেট করা হয়। দেশকে বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করাই এদের টার্গেট। কলামিস্ট ফরহাদ মজহার সত্যিই লিখেন বিদেশী হাত এর সাথে জড়িত। তার ভাষায়, "যারাই নিরাপত্তা, যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধ কৌশল নিয়ে পড়াশোনা করেন ও খোঁজ-খবর রাখেন, তারা জানেন যে, নাম না জানা যে সব ইসলামী দল, যাদের আদর্শ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, তাদের হাতে যখন বোমা-বারুদ চলে আসে, তখন সাধারণভাবে বুঝতে হবে এটা ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের কাজ। এটা সাধারণ প্যাটার্ন। ইসলামী জঙ্গিদের সাথে ইসরাইল ভারত নিরাপত্তা আঁতাতের কারণে উপমহাদেশে নব্বই দশকের শেষ বছরগুলো থেকে এ ধরনের তৎপরতা আমরা বাংলাদেশে লক্ষ্য করছি। ইসরাইল জানে যে, আরবদের মধ্যে ইসরাইলকে টিকিয়ে রাখা ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে আরব ও ইসলাম সম্পর্কে বিশ্বে ভাবমূর্তি নষ্ট করার ওপর। অর্থাৎ প্রমাণ করতে হবে, ইসলাম মাত্রই একটি বর্বর ধর্ম, 'এরা নির্বিচারে বোমাবাজি করে, নিরীহ মানুষ হত্যা করে।' মুসলমান সন্তানরা শিশু বয়স থেকেই অন্যদের ঘৃণা করতে শেখে এবং মাদরাসায় গিয়ে তারা জিহাদী হয়ে বেরিয়ে আসে।' এবারের বোমা হামলার পরপরই গণমাধ্যমগুলোর উৎকট চিৎকারের মধ্যে আমরা এই ইসরাইলী ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের প্রচারণাই মূলত আমরা দেখেছি।"

ফরহাদ মজহার ঘটনার প্যাটার্ন এবং টার্গেট প্যাটার্ন দেখে এই অনুমান করেছেন। কিন্তু এটা অনুমান নয়, এটাই সত্য। একই ধরনের ঘটনাও টার্গেট প্যাটার্নে সংঘটিত নাইন-ইলেভেনের ঘটনার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। কিন্তু হিমালয় সমান প্রচার-প্রপাগাণ্ডার আড়ালে আসল সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে, তবু এটাই সত্য হয়ে থাকবে যে, নাইন-ইলেভেনের ঘটনাও ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ ও তার সহযোগীদেরই কাজ। এ সম্পর্কে Enver Masud মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া থেকে প্রকাশিত তার গ্রন্থ "The War on Islam'-এ লিখেছেন, "On the day of the attack on America,

www.pathagar.com

the Washington Times quoted a paper by the Army School of Advanced Military Studies which said that the MOSSAD, the Israeli Intelligence Service, 'has the capability to target U.S. forces and make it a Palestinian/Arab act.' This, coupled with arrest in the U.S. of dozens of suspected Israeli spies and reports that several of the alleged hijackers that struck the World Trade Center were still alive, fuelled alternative theories." অর্থাৎ– যেদিন আমেরিকা আক্রান্ত হয়েছিল ঐদিন 'ওয়াশিংটন টাইমস' পত্রিকা 'আর্মি স্কুল অব এডভান্সড মিলিটারি স্টাডিজ'-এর বরাত দিয়ে ছাপা একটা নিউজে বলেছিল, ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'-এরই শুধু মার্কিন সামরিক বাহিনীকে টার্গেট করা এবং একে ফিলিস্তিনী অথবা আরবদের কাজ বলে চালিয়ে দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে। এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক ডজন ইসরাইলী গোয়েন্দা গ্রেফতার হওয়ারও খবর রয়েছে। কিন্তু এ খবর এবং খবর প্রকাশের কণ্ঠ মার্কিন ও বিশ্বমিডিয়ার পরিকল্পিত কোরাশের মধ্যে সকলের কানে পৌঁছেনি। কিন্তু এই সত্য চর্চা বন্ধ হয়নি। একদিন এই সত্যই সকল মিথ্যার উপর মাথা তুলে দাঁড়াবে।

ফরহাদ মজহার ইসরাইলী-ভারতীয় উদ্দেশ্যের পক্ষে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উৎকট চিৎকারের কথা বলেছেন। এই উৎকট চিৎকার শুধু আমাদের গণমাধ্যমে নয়, গোটা বিশ্বের গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে এই চিৎকার। ভারতের গণমাধ্যম ও জননেতারা এইভাবে চিৎকার শুরু করে যে জিহাদীরা যেন বাংলাদেশ গিলে ফেলেছে এবং ভারতকেও গিলে ফেলতে অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাংলাদেশ-পরিস্থিতিকে ভারতের জন্যে 'থ্রেট' হিসেবে অভিহিত করেন। গোটা এই প্রচারণা অপরিকল্পিত নয়, ঘটনার মতোই পরিকল্পিত। এই ঘটনার সাথে উপমহাদেশের আরেকটা ঘটনার হুবহু মিল পাওয়া যায়। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ-এর একজন নেতা এবং ভারতে 'শুদ্ধি আন্দোলন'-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। একজন মুসলমান এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেফতার হয়। শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে ইসলাম বিরোধীরা এ ঘটনার জন্যে গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ইসলামের মূল আদর্শকেই দায়ী করতে আরম্ভ করে।

www.pathagar.com

তারা এমনকি আল-কুরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, কুরআনের শিক্ষাই মুসলমানদের হিংস্র করে তোলে এবং তা সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সহাবস্থানের পরিপন্থী। এমনও প্রচার চলে যে, পৃথিবীতে যতদিন কুরআনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। সে সময়ের পত্র-পত্রিকাগুলোই এই অপপ্রচারের সূচনা এবং মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তারা মানুষকে উস্কে দেবার জন্যে বলে, ঘাতক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আপন ধর্মের শত্রু মনে করেই হত্যা করেছে এবং উক্ত সৎ কাজ দ্বারা সে বেহেশত পাওয়ার আশা করে। আজ আমাদের গণমাধ্যমের একটা বড় অংশ উৎসাহের সাথে কমবেশি এই প্রচারণাই চালায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তখন পত্র-পত্রিকা ছিল হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে, আর এখানে গণমাধ্যম মুসলমানদের নিজেদেরই। ফরহাদ মজহারের কথাই ঠিক, বাংলাদেশে অব্যাহত বোমা হামলার ঘটনা যে ষড়যন্ত্রের ফল, আমাদের গণমাধ্যমের ঐ অংশটি সে ষড়যন্ত্রেরই শিকার।

এই ষড়যন্ত্র অনেক দিনের এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফল। বাংলাদেশকে সন্ত্রাসী মৌলবাদী রাষ্ট্র অভিহিত করে অব্যাহত প্রচার চালিয়ে আসা হয়েছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সফর উপলক্ষে আওয়ামী লীগ সরকার 'Democracy versus Religious Fundamentalism' নামে একটি বই প্রকাশ করে। এতে বিএনপির সাথে তালেবানদের সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে তালেবানরা সক্রিয় থাকার কথা বলা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হবার পর আওয়ামী মহলের এই প্রচারণা তুঙ্গে উঠে। তারা কলকাতা, লন্ডন, প্যারিস, ব্রাসেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে সংঘবদ্ধ ও অব্যাহত অপপ্রচার চালায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। এই অপপ্রচারের মূলকথা ছিল, বাংলাদেশ জঙ্গি মুসলমানদের দেশ। এদেশ তালেবান ও আল-কায়েদাদের চারণভূমি। বাংলাদেশে মানবাধিকার বলতে কিছু নেই। এদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের কচুকাটা করা হচ্ছে, উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। সম্ভ্রম কেড়ে নেয়া হচ্ছে নারীদের আর তাদের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে দেশ। একটা অদৃশ্য শক্তির ব্যবস্থাপনায় এই অপপ্রচারে অংশ নেন বৃটেনের চ্যানেল-৪ টেলিভিশন, টাইমস ম্যাগাজিন, ফারইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ এবং আওয়ামী লীগও। যারা ইকনমিক রিভিউতে বার্টিল লিন্টনারের রিপোর্ট 'Bangladesh: Acocoon of Terror,' টাইম ম্যাগাজিনে আলেক্স পেরীর 'Deadly cargo' চ্যানেল-৪ এর জাইবা মালিক ও লিও পোল্ড-এর সাজানো রিপোর্ট

www.pathagar.com

তৈরির কাহিনী এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের 'বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ২০০১' ও 'বাংলাদেশ প্রোটেইট অব কভার্ট জেনোসাইড' পড়েছেন, তারা জানেন, এই অপপ্রচার কত জঘন্য, কত ষড়যন্ত্রমূলক। হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের 'বাংলাদেশ প্রোগ্রাম ২০০১' শীর্ষক ১৫৬ পৃষ্ঠার ম্যাগাজিনে যে প্রচ্ছদ আঁকা হয়েছে তাতেই পরিষ্কার বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে তারা কি জঘন্য দৃষ্টিতে দেখে। প্রচ্ছদে উপরের এক পাশে একটি ধর্ষিতা হিন্দু মেয়ের ছবি এবং ডানপাশে এক বৌদ্ধের মৃতদেহ। প্রচ্ছদের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ি-টুপিসহ কয়েকজন বাংলাদেশী মুসলিমের ছবি এবং নিচে লিখা রয়েছে 'বি অয়ার অব বাংলাদেশ' (বাংলাদেশের ব্যাপারে সাবধান)। এর বামে লেখা রয়েছে 'এ কুকুন অব টেরর' (সন্ত্রাসের আবাসস্থল)। প্রচ্ছদের নিচের অংশে রয়েছে একটা মিছিলের ছবি যার মাঝখানে লাদেনের ছবি জুড়ে দিয়ে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে 'প্রো বিন লাদেন র‍্যালি ইন ঢাকা।' এই প্রচ্ছদে বাংলাদেশের এমন ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যার দাবি ছিল আমেরিকা ঠিক আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু তা হয়নি। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন যেমন সে সময় বাংলাদেশকে 'মডারেট মুসলিম কান্ট্রি' বলেছিলেন, এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই বলছে।

এই পরিস্থিতিতেই অজানা-অচেনা জামায়াতুল মুজাহেদীনের আবির্ভাব এবং ১৭ই আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় ৫শ' বোমার বিস্ফোরণ। বলা যায়, বাংলাদেশ বিরোধী সব প্রচার ব্যর্থ হবার পর খোদ ষড়যন্ত্রকারীরাই বাংলাদেশে তালেবানী কর্মকাণ্ড শুরু করে যাতে হাতে-কলমে তাদের এতদিন ধরে তোলা অভিযোগের প্রমাণ হাজির করা যায় বিশ্ববাসীর কাছে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা কারা, সেটা বলার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হলো সরকার। তবে সাদা চোখে যেটা দেখা যাচ্ছে এবং সাধারণভাবেই যেটা বলা যায়, সেটা হলো, বাংলাদেশে সন্ত্রাসী ঘটনাবলীসহ বাংলাদেশবিরোধী উপরোক্ত সব প্রচারের বেনিফিসিয়ারি হলো আওয়ামী লীগ এবং তাদের মিত্রশক্তি। কারণ, সরকারকে বিব্রত করতে পারাতেই ছিল আওয়ামী লীগের লাভ, সরকারকে দুর্বল করতে পারায় ছিল আওয়ামী লীগের লাভ, জোট ভাঙতে পারাতেও ছিল আওয়ামী লীগের লাভ এবং 'মৌলবাদী' সন্ত্রাসী 'জিহাদী' নামের মোড়কে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দল, আলেম-ওলামা, মাদরাসা-মক্তব ইত্যাদি যদি নির্মূল করা যায়, কমপক্ষে যদি মাটিতে শুইয়ে দেয়া যায়, তাহলে আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্রশক্তি উভয়েই মহালাভ। তাদের এই মহালাভের বলি হচ্ছে কিছু অশিক্ষিত,

www.pathagar.com

অর্ধশিক্ষিত, কুশিক্ষিত ও বেকার কিশোর এবং বিপথগামী ও পুতুল কিছু মানুষ। কম্যুনিস্টরাও একদিন এই 'এজ গ্রুপ'কে টার্গেট করে তাদের সর্বনাশ করেছিল। আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকতে যা চেয়েছিল, আজ ক্ষমতায় আসার পরে তারই বাস্তবায়ন করছে। যুদ্ধাপরাধী ইস্যু আসলে আইন-আদালতকে ব্যবহার করার মাধ্যমে জামায়াত ও বিরোধী দলের আন্দোলনকে দুর্বল করা ও দমন করা। নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত ও বিরোধী আন্দোলনকে দমনের জন্যে সন্ত্রাসের নতুন সংজ্ঞাও আওয়ামী লীগ নিয়ে এসেছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়নকে এখন সন্ত্রাস বলা হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই সেটা হলো ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামী এবং বিএনপিসহ বিরোধী দলের আন্দোলনকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়া, পারলে নির্মূল করা।

সব মিলিয়ে সার্বিক ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা জনগণকে সাথে নিয়েই করতে হবে। এজন্যে জনগণকে প্রস্তুত করা দরকার। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন, "I am a firm believer in the people. If given the truth, they can be depended upon to meet any national crisis. The great point is to bring the real fact." 'অর্থাৎ আমি জনগণে বিশ্বাসী। যদি সত্য তাদের জানানো হয়, তাহলে যে কোনো সংকট মোকাবিলায় তাদের উপর নির্ভর করা যায়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আসল ঘটনা তাদের জানতে হবে।' আব্রাহাম লিংকন যেটা বলেছেন, জনগণকে আস্থায় নেয়ার সেই কাজটা কিন্তু আমাদের মতো দেশে কম হয়। ছোট দেশগুলো নানা কারণে অনেক কথা প্রকাশ করে না, করতে পারে না, এটা একটা বড় সত্য। কিন্তু অস্তিত্বেই যখন আঘাত এসে যায়, তখন কোনো কিছুকে আর ভয় করার, সমীহ করার অবকাশ থাকে না। মনে হয়, আমরা সে অবস্থায় পৌঁছে গেছি। সব প্রকাশ করে জাতিকে আস্থায় নেয়া এখন উচিত। Edmund Burks-এর একটা বিখ্যাত উক্তি: The pepole never give their liberties, but under some elusion অর্থাৎ– একমাত্র চরম বিভ্রান্তির মধ্যেই কেবল জনগণ তাদের স্বাধীনতা পরিত্যাগ করতে পারে। সত্য জানার অভাবেই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সত্য গোপন করে ও মিথ্যাচার চালিয়ে সুমন চক্রবর্তী ও CNN-রা আমাদের জনগণের মধ্যে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টিরই চেষ্টা করছে। জনগণের মধ্যে কিছুতেই এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে দেয়া যাবে না।

– দৈনিক সংগ্রাম, ঈদুল ফিতর সংখ্যা- ২০১৪

www.pathagar.com